আল মাহমুদ
যে পারো ভুলিয়ে দাও

যে পারো ভুলিয়ে দাও

আল মাহমুদ

JE PARO BHULIE DAW 1
A Bengli Novel by
Al Mahmud
Published By
Abdul Mannan Talib
Director
Bangla Shahitta Parishad
171, Bara Moghbazar,
Dhaka-1217
Price: Tk. 70.00
ISBN 984-485-015-0

যে পারো ভুলিয়ে দাও ১
আল মাহমুদ

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩২৪১০

প্রথম প্রকাশ
ঢাকা বইমেলা
ডিসেম্বর ১৯৯৬
বাসাপ প্র ৬২

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

বর্ণ বিন্যাস
সাবিত কম্পিউটার সার্ভিস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রক
বন্ধু প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

দামঃ ৭০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী দাদা
মীর আবদুল ওহাব-এর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

খাটের চারদিকে আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের ভীড় সরিয়ে ডাক্তার এসে রোগীর পায়ের কাছে দাঁড়ালেন। তার গলায় ঝোলানো স্টেথিস্কোপ। হাতে একটা মোটা বাঁধাই করা বই। ডাক্তারী বই-ই হবে। তিনি প্রথম পালংকের পাশে দাঁড়ানো রোগীর আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ পুত্র-কন্যা, এদের প্রায় সকলেই ডাক্তারের চেনা, এক নজর দেখলেন। স্টেথিস্কোপ কানে লাগিয়ে বুকটা পরীক্ষা করলেন। হাতের কবজিতে হাত দিয়ে নাড়িও পরীক্ষা করলেন। তারপর চুপচাপ রোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল তিনি রোগটার কোনো হদিস পাননি। রোগীর গলা দিয়ে ঘর ঘর শব্দ বেরুচ্ছিল। কষ বেয়ে কি একটা হলদেটে তরল কিছু বেরিয়ে আসছিল। ডাক্তার এক দৃষ্টিতে রোগীর মুখাবয়ব এবং সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনো প্রেসক্রিপশনের প্যাড বের করছেন না দেখে ততক্ষণে সকলেই ডাক্তারের বিব্রত মুখের ওপর ফুটে ওঠা দুশ্চিন্তার অক্ষর থেকে যেন একটা ভাষা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। ডাক্তার যে এ রোগীর কোনো সুরাহা দিতে পারবেন না এটা যেন মুহূর্তেই সকলে বুঝে নিয়েছে।

রোগীর বড় মেয়ে জাহানারা, যে এতক্ষণ অচেতন পিতার পাশে খাটের ওপর বসেছিল, সে রোগীর মাথায় হাত বুলিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আব্বা, ডাক্তার কাকা এসেছেন। একবার একটু চোখ মেলে দেখুন।'

রোগীর মধ্যে এর কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। গলা দিয়ে আগের মতই ঘর ঘর শব্দ বেরুচ্ছে। দেহটা সটান। গোলাপ ফুল আঁকা বালিশের ওপর কষ বেয়ে

হলদেটে লালা গড়িয়ে পড়ছে। খারাপ গন্ধ উঠে সে ভয়ে সম্ভবত ঘরে কেউ আগেই এককাঠি লোবান জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই সকালে সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা ডাক্তার নন্দলালের ভালই লাগছে। সাধারণত তার পরিচিত মুসলমান পরিবারে সকাল-সন্ধ্যায় ধূপধুনো জ্বালাতে তিনি কমই দেখেছেন। শেখেদের তো আর সন্ধ্যা আহ্নিক বা পূজো পার্বণের কোনো ব্যাপার নেই। ধূপধুনো জ্বালিয়ে সুগন্ধ ছড়ানোরও কোনো দরকার হয় না। তবে কেউ কেউ পাঁচ বার হাত-মুখ ধুয়ে ওজু করে যেখানে-সেখানে মাদুর বিছিয়ে পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়িয়ে যায়। এই একটা সুবিধা এদের। প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের কোনো কড়াকড়ি নেই।

লোবানের হালকা সুগন্ধি ধোঁয়ায় ডাক্তার নন্দলালের ফোলা ঘুমকাতর চোখ দু'টিতে একটু আরাম ছড়িয়ে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে মোল্লাবাড়ির এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের বাজার এলাকার প্রায় অর্ধেক দোকানপাট যার করতলগত সেই বাদশা মোল্লার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর শুনে ডাক্তার নন্দলাল তার সকালের আরামের ঘুমটা মাটি করেই উঠে এসেছেন। অনিচ্ছায় এসেছেন একথা অবশ্য বলা যাবে না। তিনি এ পরিবারের বলা যায় প্রাত্যহিক পারিবারিক চিকিৎসক। তাছাড়া মোল্লা সাহেবই তাকে এ শহরে পেশাগতভাবে দাঁড়াবার ঠাঁই করে দিয়েছেন, তার পসারে সাহায্য করেছেন। তিনি যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে দু'তলা কোঠাবাড়ি বানিয়ে একচ্ছত্রভাবে এতদঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের একডাকের চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এর পেছনে আছে এই মোল্লাবাড়ি। এই বাদশা মোল্লা। এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাকে কাকাবাবু বলে সম্মান করে।

লোবানের গন্ধটা যত মধুরই হোক, ডাক্তারের মনে হল এটা যেন মৃত্যুর গন্ধ। পেঁচিয়ে নিঃশ্বাসের সাথে মস্তিষ্কে পৌঁছে তার ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে। তিনি আবার রোগীর নাড়ি ধরতে ঝুঁকে পড়লেন। আবার পরিবেশটা থমথমে, উৎকর্ণ হয়ে রইল।

'কখন থেকে এ রকম হল?' তিনি জাহানারার দিকে মুখ তুললেন, 'আগে আমাকে খবর দিতে পারতে।'

'কাল রাতে খাওয়ার পর আমাদের বার বাড়ির বারান্দায় সিকান্দার চাচার সাথে হুঁকো নিয়ে বসেছিলেন। অই তো সিকান্দার চাচা, তাকে জিজ্ঞেস করুন।'

জাহানারার ইঙ্গিতে ডাক্তার দরজার দিকে দেখলেন। এ বাড়ির ভাগচাষী সিকান্দার আলী। কাঁচা-পাকা দাড়ি। মাথায় ময়লা কিস্তি টুপি। বয়েস পঞ্চাশ-

পঞ্চান্নর কম হবে না। খাটের পাশে কাকে যেন ঠেলে তুলে দিয়ে রোগীর পাশে একটা টুলের ওপর বসল।

'ফার্সী হুঁকোর নলটা আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আজ আর বসতে ভাল লাগছে নারে সিকান্দার। মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে। বলতে বলতেই মাদুরে নেতিয়ে পড়লেন। আমি তাকিয়া বালিশটায় ঠেস রেখে বসতে বলতে গিয়ে দেখি তিনি বমির মত শব্দ করে ছটফট করছেন। আমি চিৎকার করে সবাইকে ডাকলাম। অন্দর থেকে সবাই এসে তাকে ধরাধরি করে ছোটো বুবাইয়ের এই খাটে এনে শুইয়ে দিল। আমি ভাবলাম হয়ত রাতে খানাটা বেশী হয়ে যাওয়াতে তার বমি ভাব হয়েছে। রাতে ভাল ঘুম হলে সেরে যাবে। আমি বাড়ি চলে গেলাম।'

সিকান্দার ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলে ডাক্তার মুখ তুলে ছোটো বিবিকে খুঁজলেন। ছোটো বিবি খাটের মাথার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার মুখখানি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছিল না। মেহগনি কাঠের পালংকের কারুকার্যময় শিথানে নিজের দেহকে যতটা সম্ভব আড়াল করে বসেছিলেন। তিনি পর্দানশীন নারী। সাধারণত এ বাড়ির মুনি-মানুষ ছাড়া তিনি কোনো বহিরাগত ব্যক্তি বা পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের সামনে উদঘাটিত হন না। এমনকি ডাক্তার মন্দলালের মত পারিবারিক চিকিৎসকের সামনেও না। ডাক্তার তার কথা শুনতে চান বুঝতে পেরে ছোটো বিবি মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'গত রাতে তিনি খুব বেশী যে কিছু খেয়েছিলেন তা নয়। দু'টুকরো রুই মাছ, আর যা খান তাই। আপনি ত জানেন।'

'জানি বলেই ত জিজ্ঞেস করছি, ঐ বড়ি কটা গিলেছিলেন?'

'সব সময়ই দু' বড়ির বেশী নেন না। কালও দু'টো বড়ি নিতে দেখলাম।'

'আপনি ঠিকমত লক্ষ্য করেননি। কাল নিশ্চয়ই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।'

'আমিই আফিমের কৌটো থেকে দু'টো বড়ি দিয়েছিলাম ডাক্তার বাবু। বেশী খাবেন কোত্থেকে, আফিমের কৌটো ত থাকে আমার কাছে। তবে তার নিজের জামবাটি ভরা সরদুধ খেয়েও আরও খানিকটা খেতে চাইলে আমি আরও খানিকটা দুধ এনে দিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'দুধটুকু এক চুমুকে খেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, বারবাড়িতে ফার্সী হুঁকোটা পাঠিয়ে দিও। ইসমাইলকে বল ভাল করে তামাক সেজে কয়েকটা টিক্কা জ্বালিয়ে যেন দেয়। ইসমাইল হুঁকো রেখে ফেরার সাথে সাথেই ত এই ঘটনা।' আফিম যে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ছোটো বিবি তা অস্বীকার করলেন,

'রাতে ত এ পরিমাণ আফিমই তিনি রোজ নেন।'

ছোটো বিবির কথায় কি একটা মনে হতেই ডাক্তার তাঁর হাতের বইটার পাতা দ্রুত উল্টিয়ে একটা পাতায় দৃষ্টি স্থির করলেন। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রোগীর মুখের দিকে তাকালেন। ঘর ঘর শব্দ বুক থেকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। শব্দটা এখন বেশ জোরাল। তবে একটু আগে কষ বেয়ে যে লালা বেরিয়ে আসছিল তা এখন শুকিয়ে আছে। এর বদলে মুখটা হা হয়ে আছে। মনে হয় নাকের বদলে মুখ দিয়ে রোগীর নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে। আর ঠোঁটের ওপর জমে আছে সাদা রংয়ের অভুক্ত খাদ্যের টুকরো। সম্ভবত তা মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের করার ফলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঠোঁটে লেগে আছে। জাহানারা একটা গামছা দিয়ে রোগীর মুখটা মুছিয়ে দিল।

ডাক্তার হঠাৎ কি মনে হতেই রোগীর পায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতের বইটার শক্ত পুটের দিকটা দিয়ে রোগীর পায়ের পাতা জুড়ে একটা আঘাত করলেন। দেহটা কঠিন কোনো জিনিসের মত আপাদমস্তক নড়ে উঠল। যেন একটা অতিকায় কাঠের পুতুল নড়ছে। ডাক্তারের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই একটা শব্দ ছিটকে বেরিয়ে গেল, 'আহ্ হা।'

এই একটু আওয়াজেই দর্শনার্থীদের মধ্যে কয়েকজন ডুকরে উঠলেন। ডাক্তার রোগীর বড় মেয়ে জাহানারার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি একটু বারান্দায় এস ত মা।'

জাহানারা দ্রুত খাট থেকে নেমে ডাক্তারের পিছু পিছু বারান্দায় আসতেই ডাক্তার নন্দলাল দাঁড়ালেন।

'তোমার আত্মীয়-স্বজন, ময়মনসিংহের বোন-ভগ্নিপতিকে টেলিগ্রাম পাঠাও। আর তোমার জামাইকে বল তোমার বাপের দোকানের ক্যাশের চাবি, এ বাড়ির সিন্দুকের চাবি, কাগজপত্র এনে তোমার কাছে রাখতে। তোমার ভাইয়েরা ত নাবালক। তোমার বাপের বিপুল অর্থবিত্ত, জমিজিরাত, দোকানপাট যাতে সাত ভূতে লুটে না খায় সেটা দেখতে হলে তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। তোমার জামাই ভাল মানুষ হলে কি হবে, তার পক্ষে জ্ঞাতিশত্রুদের ঠেকানো মুস্কিল হবে। আমি মনে করি, তুমি হয়ত বা ঠিকমত ঠেকনা দিতে চাইলে এসব থাকতেও পারে। অন্তত বাজে লোকের হাতে পড়বে না।'

'এসব কি বলছেন ডাক্তার কাকা? আমার আব্বা...?'

'না আর আশা নেই। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা।'

ডাক্তার যেন রোগটা এতক্ষণে ধরতে পেরেছেন।

'আব্বার কি হল ডাক্তার কাকা?'

এখন আর উৎকণ্ঠা নেই, জাহানারা রোগটার নাম জানতে চায়।

'তোমার আব্বার সন্ন্যাস রোগ হয়েছে। এ রোগে মস্তকের ভেতরের শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে গিয়ে দেহ পঙ্গু হয়ে যায়। এটা আফিমের নেশার জন্যই হয়েছে এটা আমি বলব না। তবে তোমার বাপের সবসময় মাথায় রক্ত উঠে থাকত বলে আমি কয়েকদিন আগেও তাকে সাবধান করেছিলাম। আফিমের মাত্রা আরও কমিয়ে আনতে বলেছিলাম। আর ভোজনের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। জানতাম এসব তিনি শুনবেন না। আসলে মা তোমার আব্বার আয়ু ফুরিয়ে গেছে। এখন সবকিছু ঈশ্বরের হাতে। তুমি আর তোমার স্বামী তার সয়সম্পত্তি একটু আগলে রাখার চেষ্টা কর। তোমাকে যখন পরিবারের মধ্যেই তিনি বিয়ে দিয়ে গেছেন তখন তোমার নাবালক ভাইদের দেখার দায়িত্বও তোমাকেই নিতে হবে। আমি আসি।'

জাহানারাকে এক রকম নির্বাক করে দিয়েই যেন ডাক্তার সিঁড়িতে নেমে তার সাইকেলটায় হাত দিলেন।

'জাহানারাও দ্রুত নেমে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাকাবাবু সিন্দুকের চাবি ত বড় আম্মার কাছে থাকে। তিনি এখন তার বাপের বাড়িতে। এখন বোধ হয় খবর পেয়েছেন। ক্যাশ টাকা আর পরিবারের গয়নাগাটি ঐ সিন্দুকে।' জাহানারা হ্যান্ডেলে হাত রেখে কথা বলছে, 'আপনি ত জানেন আমার বড় আম্মা নিঃসন্তান। আব্বার সাথে তার বনিবনা হয়নি কোনোদিন। এ জন্যই নিঃসন্তান। কিন্তু টাকা পয়সা দলিল দস্তাবেজের ব্যাপারে তিনি আব্বার বিশ্বস্ত ছিলেন বলে আব্বা সিন্দুকের চাবি তার কাছেই রাখতেন। আমার মা মরার পর চাবি আমাকে রাখতে দিতেন। আমার বিয়ের পর এখন বড় আম্মা রাখেন।'

'চাবিটা তুমি যে করেই হোক তার কাছ থেকে নিয়ে নেবে।'

'কি করে নেব কাকা, তিনি যদি না দেন?'

'চাবিটা তোমার হাতে রাখবে। এর বেশী এখন আমার আর কিছু বলা ঠিক হবে না। তুমি সিকান্দারের সাহায্য নাও। ও তো তোমাদের সামনের মাঠের জমিগুলো চাষ করে। আচ্ছা, তোমাদের এই বাড়ির সামনের ঐ মাঠে কি পরিমাণ জমি আছে?'

জাহানারা এ ব্যাপারে কিছু জানে না। সে কিছু বলার আগেই পেছন থেকে কে যেন বলল, 'দেড় দ্রোন।'

জাহানারা ও ডাক্তারবাবু মুখ ফিরিয়ে দেখল বাড়ির গরু-বাছুরের রাখাল ইসমাইল দাঁড়িয়ে আছে। সে মাঠেরও কাজ করে। উঠোনে ধানের মলন দেয়। শোলা ও পাট শুকায়। মোল্লা সাহেবের খাস নকর। ডাক্তার জানেন লোকটা

মোল্লা সাহেবের খুব বিশ্বস্ত।

'দেড় দ্রোন ত অনেক জমি।'

'জি বাবু, এত জমি এ তল্লাটে কৃষ্ণনগরের জমিদার বিহারী বাবুদেরও নেই। আমি এক সময় বাবুদের গাঙের পাড়ের জমি চষেছি বলে জানি।' ইসমাইল হাত কচলে হাসল, 'আমি এ বাড়ির জমিজমা সম্বন্ধেও জানি বাবু, বাড়ির বৌ-ঝিদের চেয়ে বেশি জানি। এরা কোত্থেকে জানবেন? এরা ত আর হুজুরের ক্ষেতে হাল দেন না। তিতাসের পূব পাড়ের দত্তখোলায় আমার মালিকের এক শ' কানি বোরো জমি আছে। উলচা পাড়ায় আছে বিশ কানি। এ গাঁয়ের ভেতরে যে আম বাগানটা এদের আছে তার লাগোয়া মাঠে আছে দশ কানি।'

ডাক্তার বাবু সাইকেলটা বারান্দার সিঁড়ি থেকে বারবাড়ির উঠোনে ঠেলে নামিয়ে আনতে গিয়ে জাহানারার দিকে তাকালেন, 'ধানী জমির এক রাজত্ব রেখে যাচ্ছেন তোমার আব্বা। বুঝে শুনে ধরে রাখতে পারলে বাজারের দোকানপাট গুটিয়ে ফেললেও চলবে। যখন তোমার ভাইয়েরা সকলেই ছোট। তোমার ছোট মায়ের ঘরে তোমার কয় ভাই যেন আছে?'

'দুই জন। একজন বারো, একজনের মাত্র দশ।'

'তোমার নিজের ভাই ত তিনজন। বড় জনের বয়েস কত?'

'শওকতের বোধহয় এখন বাইশ। সবাই পিঠেপিঠি। সাফফাতের বিশ। আর সারোয়ারের আঠারো। আমি ত এদের সকলেরই বড় ডাক্তার কাকা, আমার ছাব্বিশ। আর ছোটটার, ময়মনসিংহে যার বিয়ে দিয়েছি, সেই আনুর বোধহয় চলছে চব্বিশ।'

জাহানারা নিজের ভাইবোনের কথা বলে একটু বোধহয় হাসতে চাইল। এর মধ্যেই রোগীর ঘর থেকে সম্মিলিত বিলাপের সুর ভেসে আসাতেই সে থতমত খেয়ে গেল।

'তোমার আব্বা বোধহয় বিদায় নিলেন। আমি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে তার এই কষ্টের হাত থেকে মুক্তির প্রার্থনাই করছিলাম। যাও মা, সবাইকে নিয়ে তার শেষের আয়োজন কর। আর আমার উপদেশগুলো মনে রেখ।'

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই জাহানারা ছুটে ভেতরে চলে গেল।

•

লাশ দাফনের একদিন পর মোল্লাবাড়ির কনিষ্ঠা কন্যা আনোয়ারা স্বামী-পুত্রসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে বিলাপ করতে করতে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল। সাথে তার শিক্ষক স্বামী। বোনকে দেখে জাহানারা দ্রুত

বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে এলে দু'বোন কোলাকুলি করার মত একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। দু'বোনকে জড়াজড়ি করে বিলাপ করতে দেখে আনোয়ারার স্বামী একটু ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল, 'আহা আনু এটা কি বিলাপের সময়? তোমাকে আগেই এত বুঝিয়ে আনলাম যে বাড়ি গিয়ে বিলাপ করবে না। আমার শ্বশুর আল্লাহর ইচ্ছেয় ইন্তেকাল করেছেন। হায়াত মওত ত আল্লাহর হাতে। কে জানে কার কিভাবে কখন মরণ হয়। আমার শ্বশুর সোজা-সরল মানুষ ছিলেন। তার ছেলেরা কেউ এখনও তার ব্যবসায়-বাণিজ্য, জমিদারী, দোকানপাট নগদ টাকা কড়ি বুঝে নেয়ার মত উপযুক্ত হয়নি। এতদিন ত তোমার আপনজন যারা আমার শ্বশুরের কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছে তারাই দু'হাতে লুটেপুটে খেয়েছে। তুমি দূরে ছিলে বলে দেখতে আসনি। এখন আল্লাহর মর্জি তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এখন কেন এই বিপুল সম্পত্তি দশ ভূতে লুটে খাবে? এখন নিজেরটা বুঝে নেয়ার সময় এসেছে। তোমার কি এখন বিলাপ করা সাজে?'

ছোট বোনের জামাইয়ের 'কাছাকাছি থাকার সুযোগ' কথাটা কানে যেতেই জাহানারার কান্না থেমে গিয়েছিল। সে মুহূর্তের মধ্যেই ধরে নিল তাকে উদ্দেশ্য করেই আনুর স্বামী এসব কথা বলছে। জাহানারা বোনের হাত নিজের গলা থেকে আস্তে করে খুলে নিয়ে বলল, 'আয় ঘরে আয়।'

আনুর জামাই বুঝতে পারল তার শ্লেষটা আনুর অগ্রজার কানে ঠিকমতই সে তুলে দিয়েছে। মুখে অবশ্য বলল, 'আরে এই ত বুজান, দেখেন ত আপনাকে কদমবুসী করতেও ভুলে গেছি। ভুলবো না, এমন একটা দুঃসংবাদ পেয়ে আমার আর আপনার বোনের কি মাথা ঠিক আছে?'

আনুর জামাই নুয়ে জাহানারার পা ছুঁতে গেলে জাহানারা এক পা পিছিয়ে গেল, 'থাক, থাক। আজকাল ওসব কেউ করে না। তোমরা এখনও উঠোনেই কেন দাঁড়িয়ে রইলে? চল, আগে ঘরে গিয়ে ত ঠান্ডা হও। পরে সব শুনবে। যা করতে হয় করবে।'

'আমরা কিছু করতে আসিনি বু'জান। আপনি আর দুলাভাই থাকতে আমাদের কি করার আছে? এখন ত আপনারাই এ বাড়ির মুরুব্বী, মালিক।'

'বারে আমি মালিক হব কেন? আমার বাপ আমাকে এ শহরেই বিয়ে দিয়ে গেছেন বলে আমি বিপদে-আপদে তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে পারি। কিন্তু আমার বোন তা পারে না। পারে না বলে কি তোমাদের দায়িত্ব কম? আমার এতিম ভাইবোনদের জন্য আমি যেমন, তোমরাও তেমনি মুরব্বী।

'সেটা ত ঠিকই।'

একটু হাসতে চেষ্টা করল আনুর জামাই।

জাহানারা বলল, 'আগে ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে কিছু খেয়ে বিশ্রাম নাও। খিদেয় ছেলেমেয়েগুলোর মুখ শুকিয়ে আছে।'

'ঘরের কথা যখন বললেন বুজান তখন আগেই একটা দাবী জানিয়ে রাখি।'

জাহানারা হেসে বলল, 'বল না তোমার কি দাবী?'

'আমাদের মাঝের কোঠায় থাকতে দেবেন। বোঝেন ত আমি মাষ্টার মানুষ। আলো-বাতাস জিয়াদা থাকলে আজাদ পত্রিকাটা ঠিকমত পড়তে পারি।'

এ কথায় জাহানারা খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকল। ঐ মাঝের কামরাটিতে স্বামী-পুত্র নিয়ে গত কয়েক মাস জাহানারা বাপের বাড়িতে আছে। জাহানারা বাপের বাড়িতে স্থায়ী বাসিন্দা নয়। পাশের গ্রামেই তার নিজের বাড়ি অর্থাৎ শ্বশুরের ভিটে। স্বামী যেহেতু তার বাপের কায়কারবারেই সহযোগিতা করে, সে কারণে মাঝে-মধ্যে তার আব্বাই জামাতার সাথে কায়কারবারের ব্যাপারে একান্তে পরামর্শের জন্য ডেকে আনেন। সাথে জাহানারাও ছেলেমেয়েসহ বাপের বাড়িতে এসে ওঠে। বাপের পছন্দের খাওয়া-পরার ব্যাপারে বাড়ির জ্যেষ্ঠা কন্যাই বেশী আগ্রহী থাকে। মেয়ে একবার কিছুদিনের জন্য এলেও বাপ তাকে সহজে ছাড়তে চান না। এ কারণেই জাহানারা একবার এলে দীর্ঘদিন এখানেই থাকে। আর থাকে বাপের কামরার পাশে মধ্যের কামরাটিতে। ছ'কোঠার এই বিশাল একতলা ইমরাতটিই বৃটিশ আমলে এ শহরের ধনী মুসলমানদের দালান-কোঠার মধ্যে চোখে পড়ার মত প্রকাণ্ড বসতবাটি। এ রকম বাড়ি এ গাঁয়ে আর একটি মাত্র আছে। সেটা হল গাঁয়ের গীর্জার পাদরী ফাদার জোনসের একই রকম ছ' কোঠারই একটি বাসস্থান। বাড়ি দু'টি দেখলে যে কেউ মনে করবে সম্ভবত বাড়ির মালিকেরা যুক্তি-পরামর্শ করে বাড়ি দু'টি নির্মাণ করেছেন। এ রকম অনেকেই ভাবে। কারণ, বাদশা মোল্লার সাথে পাদরী মহাশয়ের বন্ধুত্বের কথা এতদঞ্চলে সবাই জানে।

এখন আনুর জামাই জাহানারার কাছে বাড়ির ঐ মাঝের কামরাটিই দাবী করায় আনু একটু বিব্রতবোধ করলেও চক্ষুলজ্জায় বিমূঢ়ের মত রাজি হয়ে গেল।

'ঠিক আছে তোমরা মাঝের ঘরটিতেই থাকবে। তবে এখন অন্য একটা ঘরে লটবহর রেখে খেয়ে বিশ্রাম নাও। আমি এই অবসরে তোমাদের জন্য কামরাটা খালি করে দেব। এখন ঘরে চল। আয় আনু।'

বোনের হাত ধরে জাহানারা বারান্দায় উঠল।

২

এখনও মোল্লা সাহেবের, ক্যাশ, দলিল দস্তাবেজ ও গয়নাপত্র বা সোনাদানার সিন্দুকে কেউ হাত দেয়নি। সিন্দুকের চাবি যার কাছে তিনি মোল্লা সাহেবের বড় বিবি। তিনি মোল্লা সাহেবের মরণমুহূর্তে পাশের গাঁয়ে নিজের বাপের বাড়িতে ছিলেন। আর তার সুস্থ সবল ষাট-উর্ধ্ব বয়সের স্বামীর মৃত্যু ছিল এমনি আকস্মিক যে খবর পেয়ে তিনি কতক্ষণ হতভম্বের মত লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পরে যখন বুঝতে পারেন তিনি এমন এক দুঃসংবাদ শুনছেন যা একটু অভাবনীয় হলেও তার বাকী জীবনের জন্যে মোটেই অনুতাপজনক হবে না। তখন তিনি শোকেই হোক কিংবা প্রতিহিংসার মনোগত জটিল অনুভূতির কারণেই হোক, অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ধরাধরি করে তাকে একটা খাটে শুইয়ে মুখে পানির ঝাপটা মারতেই তার জ্ঞান ফিরে আসে। তাকে তার ভাইয়েরা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেন। যদিও তার বাপের বাড়ি থেকে নিজের বাড়ির দূরত্ব একটি মাঝারি পুকুর মাত্র। মৌড়াইল গাঁয়ের ষ্টেশন পাড়ার পূব দিকটায় বড় বিবির বাপের বাড়ি। আরও পূবদিকে জর্জ ফিফ্থ হাই স্কুল। স্কুলের সামনে পুকুরটা। পুকুরের পূর্বদিকে বাদশা মোল্লার নতুন বাড়ি। এককালে নতুন বাড়ির বাসিন্দারাও ঐ পশ্চিমের পুরানো বাড়ি অর্থাৎ আদি মুল্লা বাড়ি থেকেই এদিকে এসেছে। এরা মূলত সামন্ত স্বভাবের প্রাচীন মুসলিম জোতদারদেরই বংশ। এরা এককালের ভূমি নির্ভর মোগল-পাঠানদের দেয়া সনদের বলে ভূসম্পত্তির সুবিধাভোগী শ্রেণীর পরিবার। বৃটিশ আমলের দু'শো বছরের মধ্যে দেড়শো বছর এরা কেবল জোতজমি ধরে রাখার চেষ্টায় জীবনপাত করেছে। কেউ বৃটিশদের কোন চাকুরী গ্রহণ কিংবা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হিন্দু অভিজাতদের মত ধনেজনে বেড়ে ওঠার সুযোগ নেয়নি। নেয়নি অবশ্য ধর্মীয় কারণে। মোগল বা পাঠান আমলে এরা ধর্মের ধার যে তেমন ধারত তেমন মনে হয় না। কিন্তু বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এরা নিজেদের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মত ইসলামকেও আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেছে। বৃটিশ আমলের শেষদিকে উনিশশো তিরিশ খৃষ্টাব্দে এরা ইংরেজী শিক্ষার সুবিধাগুলো উপলব্ধি করার সাথে সাথেই বিপুল প্রতিযোগিতার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রতিযোগীরা সকলেই ছিল হিন্দু জমিদার জোতদারদের সন্তান এবং বৃটিশদের মনোরঞ্জনে স্বাভাবিকভাবে অগ্রবর্তী সমগ্র বর্ণ হিন্দু যুব সমাজ। এদের সাথে

চাকুরীর বাজারে প্রতিযোগিতার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ধনী মুসলমান জোত-জমির মালিকেরা সোজাসুজি ছোটোখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য, শহরে গঞ্জে কাপড়, কৃষিদ্রব্য, চামড়ার জিনিসপত্র, ধানচাল ও পাটের ব্যবসার দিকে হাত বাড়ায়। পুঁজি সংগ্রহের উপায় ছিল বিপুল ভূসম্পত্তির কিয়দংশ হাতছাড়া করে নগদ টাকা। এর মধ্যে যে কৃতিত্ব নিজেদের ভাগ্যে কুলোয়নি অর্থাৎ ইংরাজী স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা লাভের সুযোগ, সে সুযোগটা যাতে নিজেদের ছেলে-মেয়েরা আয়ত্তে আনতে পারে সে চেষ্টাও এরা আন্তরিকভাবেই শুরু করে। টাকা ও বিপুল জমির মালিক বাপেরা নিজের প্রায় নিরক্ষর কম শিক্ষিত কন্যার জন্যও ইংরাজী শিক্ষিত মুসলিম জামাই কিনতে প্রতিযোগিতায় নামে। ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গজিয়ে ওঠার এক ধরনের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়। এই ভিত্তিরই প্রথম স্তরের মানুষ ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই মোল্লাদের লতাগুল্ম।

আজ কুলখানি। লাশ দাফনের চারদিন পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ও শহরের আশপাশের মাতব্বর শ্রেণীর কয়েকজন লোক, স্থানীয় খৃষ্টান মিশনের পাদরী, বাজারের বড় আড়তদার শ্রেণীর কয়েকজন, মরহুম মোল্লা সাহেবের বৈঠকখানায় জমায়েত হয়েছে। ডাক্তার নন্দলালও আছেন। এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ির মানুষই উদ্যোগী হয়ে ডেকে এনেছে। এনেছে জাহানারার স্বামী তৈমুর মোল্লা। মোল্লা সাহেবের চল্লিশার জিয়াফতের আগেই, আজকে কুলখানির দিনেই যাতে মরহুমের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ টাকা পয়সা ও সোনাদানার কথা তার উত্তরাধিকারীরা জানতে পারে, এ নিয়ে পরে যাতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনো সন্দেহ ও ঝগড়ার সৃষ্টি না হয়, সে কারণেই আজকের এই ব্যবস্থা। চাবি বড় বিবির কাছে থাকলেও লোহার সিন্দুকটা আছে জাহানারার ঘরে। মূলত এঘরেই চিরকাল ক্যাশের সিন্দুকটা থাকে। যে ঘরে এখন জাহানারার ছোটো বোন আনোয়ারা তার স্বামী আমজাদ ও ছেলেপিলে নিয়ে উঠেছে। জাহানারা এঘরটা ছেড়ে চলে গেছে একেবারে পশ্চিমের কোঠায়। এঘরে সাধারণত কাঁচের জিনিসপত্রের দু'টি বড় আলমারী ও অতি প্রাচীনকালের একটি কারুকার্যময় পালংক পড়ে থাকে। মেয়ে মেহমান কেউ এলে থাকেন। পালংকটা চীনা ছুঁতোর দিয়ে এ পরিবারের কোনো আদিপুরুষ কেউ বানিয়েছিলেন। খুব জমকালো খাট বলে কেউ এখাটে এসে শোয় না। অগত্যা জাহানারাকে এখাটে এসেই বিছানা পাড়তে হয়েছে। তার দশ বছরের ছেলে মাহমুদকে নিয়ে এঘরেই এখন তার আলনা, স্যুটকেস ও অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র মাঝের ঘর থেকে এখানে এনে সাজিয়েছে। সিজিল করে সবকিছু গুছিয়ে রাখার একটা যাদু আছে। জাহানারা

সেটা জানে। গোছানো মাত্রই প্রায় পরিত্যক্ত কামরাটা যেন ঝলমলিয়ে উঠেছে। জাহানারা কামরাটা গুছিয়ে তোলার পর আনুর স্বামী একবার পায়চারী করতে করতে এঘরে এসে ঢুকেই চমকে গেল। যেন সে ইতিপূর্বে এঘরে আর কখনো আসেনি।

'এঘরে তো আমরাই থাকতে পারতাম। আপনাকে অযথা কষ্ট দিলাম।'

'না কষ্ট কি, তোমার তো আবার পত্রিকা পড়তে হয়।' জাহানারা মৃদু হাসার ভঙ্গী করল। 'ওঘরে একটু আলো বাতাস বেশীই' পাবে। তোমরা তো মাত্র ক'দিনের জন্য। আমরা তো বলতে গেলে এ বাড়ির সারা বছরের বাসিন্দা। দু'দিনের জন্য মাঝের ঘরটা আনুকে ছেড়ে দিয়ে আমার ভালই লাগছে। তুমিও আজাদ পত্রিকাটা ঠিকমতই পড়তে পারবে।'

আনুর জামাই আমজাদ ঘরটার পরিচ্ছন্নতা ও আসবাবের গোছগাছ দেখে কেমন যেন একটু দমে গেল, 'এঘরেও আলো বাতাস মন্দ নয় বু'জান। এখন মনে হচ্ছে আপনাকে মাঝের ঘরটা ছেড়ে দিতে বলাটা আমার বেয়াদবী হয়েছে। আমাকে মাফ করে দিন। আপনি যদি চান আমরা এখানেই থাকব। আপনি আগের মত মাঝের কামরায়ই গিয়ে থাকুন। এতে দুলাভাইয়ের সুবিধে হবে। আমার কথার জন্য এখন খুব লজ্জা পাচ্ছি।'

একথার সহসা কোনো জবাব দিল না জাহানারা। তার মুখও ললাট কঠিন হয়ে উঠল। সে তখন ঘরের আলমারী দু'টোর কাঁচের পাল্লা ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করছিল। এসময় বাচ্চা কোলে আনু এসে ঢুকল কামরায়। স্বামীর কথাগুলো তার কানে গেছে। সে বুঝতে পারল পরিত্যক্ত এই পশ্চিম সাইডের কামরার হঠাৎ জলুস দেখে তার স্বার্থপর স্বামীটি নির্লজ্জের মত বুবুর কাছে একামরাটাই এখন দাবী করছে। সে সোজাসুজি আমজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কি বলছ?'

'না বলছিলাম কি, মাঝের ঘরটা থেকে বু'জান আর দুলাভাইকে এঘরে আসতে বলা আমার ঠিক হয়নি। আমরা এঘরটা নিলেও অসুবিধে হত না। দেখো না এঘরেও কেমন আলোবাতাস। আর কেমন সাফ-সুতরো লাগছে। খাটটাও বেশ বড়। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বেশ পা মেলে শোয়া যেত। আমার খুব বেয়াদবী হয়েছে আনু, আমি বু'জানের কাছে মাফ চাইতে এসেছি।'

জাহানারা আগের মতই মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল মাত্র। তার ললাটরেখায় রাগ ও অস্বস্তি ফুটে বেরুচ্ছে, 'তোমরা যে কয়দিন আছ মাঝের ঘরেই থাকবে। আজ আব্বার কুলখানী। এখন দোয়া হবে। হাফিজ সাহেব কোরআনখানি শেষ করেছেন। তুমি গিয়ে মাগফেরাতের দোয়ায় শরীক হও।'

এতক্ষণ জাহানারা বোনের জামাইয়ের মুখের দিকে তাকায়নি। এখন সোজাসুজি মুখ তুলে দেখল, 'আর শোন, তোমার দুলাভাই এবাড়িতে মাঝে মধ্যে রাতে থাকলেও, নিজের বাড়িতেই থাকে। তার নিজের বাড়িটা খালি ফেলে শ্বশুর বাড়িতে পড়ে থাকার মানুষ সে নয়। আমার বাপের টানে আমি এখানে পড়ে থাকি বলে, তাছাড়া বাজারের হিসেবপত্র ও কায়কারবার নিয়ে আব্বার সাথে নিত্য পরামর্শ করতে হয় বলে সে কোনো কোনো রাতে এবাড়িতে থেকে যায়। তৈমুর এবাড়ির ঘরজামাই নয়। তুমি তোমার দেখার অসুবিধের কথা বলাতে আমি মাঝের ঘরটা ছেড়ে এসেছি। এখন দেখছি এঘরটা দেখেও তোমার ভাল লাগছে। কিন্তু আমি আর জিনিসপত্র টানাটানি করতে পারব না। তোমার বউ যদি পারে করুক।'

বোনের বিরক্ত কণ্ঠস্বরে আনু সহোদরার চাপা ক্রোধটা আন্দাজ করতে পারল।

'না আমি জিনিসপত্র টানাটানি করতে পারব না।' বেশ রাগত দৃষ্টিতেই স্বামীর লোভী বেহায়া মুখের দিকে মুখ তুলল আনু, 'তোমার মাঝের ঘর পেয়েও সাধ না মিটলে বুবুর জিনিসপত্র ওঘরে তুমিই নিয়ে যাও। আব্বার কুলখানীর দোয়ায় শামিল না হয়ে কে তোমাকে অন্দরে পায়চারী করে বেড়াতে বলেছে? একটুও লজ্জা লাগছে না তোমার?'

'আহা রাগ করছ কেন? আমি কি এঘরটাও চাইতে এলাম নাকি? বললাম এঘরটাও মাঝের কামরার মতই ভাল। বু'জানকে ওঘর থেকে সরিয়ে আমার অপরাধ হয়েছে। আমি মাফ চাই।'

'যাক তোমার আর মাফ চাইতে হবে না। বারবাড়ির ঘরে গিয়ে আমার বাপের জন্য মাগফিরাতের দোয়া মাঙো। আমি ঘরবাড়ি ভাগাভাগি করতে বা পাওনা আদায় করতে এবাড়িতে আসিনি। এসেছি আমার বাপের মরার খবর পেয়ে। যার টাকায় তুমি বিদ্যার জাহাজ হয়েছ।'

'আহা তুই ওকে ওভাবে বলছিস কেন?' বোনের প্রতিবাদে এখন হঠাৎই জাহানারার রাগটা পড়ে গেল, 'ওতো আর এঘরে আসার কথা বলেনি। বলেছে এঘরটাও ভালো।'

'ওকি বলেছে আমি তা শুনেছি বুবু। ওর কোনো কিছুতেই পরিতৃপ্তি নেই।'

বলেই আনু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে জাহানারা হাসল, 'ওর ওপর রাগ করোনা আমজাদ। জানই ত ও একটু রগচটা। ঠিক আছে তোমার যখন এঘরটা পছন্দ তখন না হয় কাল থেকে আমিই আবার মাঝের কামরায় জিনিসপত্র নিয়ে যাব। এখন গিয়ে সবার সাথে মাগফিরাতের দোয়ায় শামিল হও। তোমার জন্যে

হয়ত সবাই অপেক্ষা করছে।'

'দেখুন বু'জান আপনার বোনের ব্যবহারটা! আমি কি ঘরবাড়ি ভাগাভাগি করতে এসেছি নাকি, আপনি বলুন? আপনার কাছে আবদার করে মাঝের কামরাটা চেয়েছিলাম। আমি ত আমার বেয়াদবীর জন্য মাফ চাইছি। চাইনি বলুন?'

'আহা এতে মাফ চাওয়ার কি হল? আমি ত খুশী হয়েই ওঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। এখন অন্তত একটা দিন পার হতে দাও। আজ বাইরের মেহ্মানরা উঠোনে বসে আছে সিন্দুকের ভেতরে টাকাকড়ি গয়নাপত্র কি আছে তা সবার সামনে খুলবে বলে। বড় আম্মার কথাতেই সবাইকে ডেকে আনা হয়েছে। যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহ না থাকে। ভাগাভাগি যদি হয় তাহলে তোমাদের যা পাওনা তা তোমরা নিয়ে যাবে।'

জাহানারার একথায় আমজাদের চেহারায় এক ধরনের প্রফুল্লতার অভিব্যক্তি ছড়িয়ে গেল।

'দেখুন ত বু'জান আপনার বোন এই সহজ বিষয়টা বুঝতে না পেরে আমার ওপর সহসা চটে গেল। আমি কি ভাগাভাগির কথা তুলেছি নাকি? আনুকে বুঝিয়েছি ভাগ হলে আনুরটা আনু যেন বুঝে নেয়। আমি তাহলে বারবাড়ির দিকে যাই বু'জান। সেখানে শুনলাম এক ইংরেজ সাহেব পর্যন্ত এসে হাজির।'

'হ্যাঁ, আমার বাপের বন্ধু মিষ্টার জোনস্। আমাদের পাদরী চাচা। আনু ত ওর মিশন স্কুল থেকেই মাইনর পাশ করেছিল। দেখো ওকে যেন সালাম দিও। আমরা পাদরী চাচাকে কদমবুসী করি। তোমার বিয়ের সময় তিনি নিউজিল্যান্ডে তার দেশের বাড়ি বছরখানেকের জন্য গিয়েছিলেন। তোমার সাথে জানাশোনা হয়নি। খুব ভাল আর দরদমন্দ মানুষ।'

আমজাদকে মুরুব্বী সম্বন্ধে সতর্ক করল জাহানারা। জাহানারা জানে আমজাদ ইংরেজী শিক্ষিত এবং কলেজের শিক্ষক বলে একটু নাক উঁচু ভাব আছে। শেষে না আমন্ত্রিত এবাড়ির কোনো শুভাকাংখীকে আনুর জামাই যথাযথ সম্মান না দিয়ে সমালোচনার পাত্র হয়।

'তাহলে ত ওর সাথে খাতির করা দরকার। রাজার জাত তো, চেনা পরিচয় থাকলে আখেরে ভাল একটা জায়গায় চাকুরীও জুটে যেতে পারে।'

আমজাদ হাত কচলে হাসল, 'তাহলে ওদিকেই যাই বু'জান।'

জাহানারা হেসে সম্মতিসূচক মুখভঙ্গী করল। বোনের জামাই বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই তার চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল। সে জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে বিরক্তিভরে বাইরে থু থু ফেলল।

কোরআনখানির পর দোয়ার মাহফিল ভেঙে গেলে বারবাড়ি থেকে অন্দরে খবর এল অঞ্চলের মুরুব্বীরা অন্দরে আসছেন। জাহানারা ছুটে গিয়ে তার বড় আম্মার কামরায় ঢুকল। জাহানারাকে দেখেই বড় আম্মা বললেন, 'এই নে চাবি। সিন্দুকের মালামাল আর টাকাকড়ি গয়নাপত্রের হিসেব হয়ে গেলে চাবিটা তোর কাছেই থাকবে। আমি আর এসব দায়দায়িত্ব বহন করব না। আর সিন্দুকে সোনাদানা যা আছে সবি তোদের। তোর মার। আমার অলংকার আমি আগে থেকেই নিজের কাছে রেখেছিলাম। ছোটবিবির গয়নাও ছোটো বিবি নিজের ঘরেই তুলে রেখেছে। সিন্দুকে দলিলপত্র ও নগদ টাকা ছাড়া আর সবকিছুই তোদের। সিন্দুকটা খোলার সময় তুই সামনে থেকে সব বুঝে নিবি। সিন্দুক খুলবে ডাক্তার বাবু নিজের হাতে। সিকান্দারও থাকবে।'

'আপনি থাকবেন না সামনে?'

'আমি বাড়ি ভর্তি মানুষের সামনে কি করে যাই? সেখানে কৃষ্ণনগরের জমিদার বিহারী বাবু থাকবেন। এসব মানুষ কোনোদিন এক লহমার জন্যও মোল্লাবাড়ির বউবিনদের দেখেনি। আমি যাব না। তুই, তোর জামাই, তোর ভাইবোন আর তোর সৎভায়েরা থাকবি।'

'ছোট আম্মা?'

'সেও সম্ভবত যাবে না। তবে বোরখা পরে জানালায় দাঁড়াতে পারে।'

জাহানারা বড় আম্মার হাত থেকে চাবিটা নিল। চাবি হাতে নিয়ে আড়চোখে বড় আম্মার মুখভঙ্গী লক্ষ্য করল। কঠিন নাক উঁচু ভাব। জাহানারা সবসময় বড় আম্মাকে সমীহ করে চলে। তিনি অল্প কথা বলেন। তার মা জীবিত থাকতে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি জাহানারার আম্মাকে শান্তিতে থাকতে দেননি। কারণ জাহানারার আম্মা ছিলেন অসাধারণ রূপসী। সাধারণ গরীব ঘরের মেয়ে। রূপ দেখেই তার আব্বা তার আম্মাকে নিকাহ করেন। আম্মা ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালিনী অনুভূতিপ্রবণ মহিলা। যেমন রূপবতী তেমনি পিতার ওপর গভীর প্রভাবশালিনী। তার কথাতেই আব্বা উঠবস করতেন। তিনিই মৌড়াইলের পুরনো বাড়ি ছেড়ে এই তেরবিঘা জমির ওপর নতুন বাড়ি বানিয়েছিলেন। দালানকোঠা, গোয়াল, গোলাঘর, পুকুর সবি আম্মার পরিকল্পনা এবং পরামর্শ অনুযয়ী আব্বা তৈরী করেছিলেন। এজন্য আম্মা ছিলেন সতীনের দু'চক্ষের বিষ। তাছাড়া বড় আম্মা নিঃসন্তান থাকায় তার নিজের মায়ের প্রতি বড় আম্মার আত্মীয়-স্বজনের আক্রশের সীমা ছিল না। হঠাৎই জাহানারার আম্মা উলাওঠায়

মারা যান। তিনি তিন ছেলে ও দুই কন্যা রেখে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলে আব্বা তৃতীয় বিয়ে করেন ছোটবিবিকে। তিনিও গরীব ঘরের উচ্চ বংশের মেয়ে। তবে জাহানারার আম্মার মত প্রতিপত্তি বিস্তার করে এবাড়িতে চরাট করে বেড়াবার মত মনের জোর বা সাহস তার ছিলনা। বড় আম্মা তাকেও দেখতে পারেন না। তবে জাহানারার আব্বা তৃতীয়বার বিয়ে করলে বড় আম্মা হঠাৎ কেন যেন জাহানারার মরহুম আম্মার জন্য আপসোস করতে থাকেন। বলেন, এমন সতীন আর তার কপালে জুটবে না। যেমন রূপ ছিল, তেমনি ছিল সবার সাথে দিলখোলা ব্যবহার। অর্থবিত্ত, সোনাদানার প্রতি লোভ ছিল না। কাবিনে লেখা দশকানি জমিও কোনোদিন খুঁটি পুঁতে আলাদা করে দিতে বলেনি। বড় আম্মার ভাইয়েরা এ বাড়িতে পা রাখলে জাহানারার আম্মাই তাদের আপন ভাইয়ের মত আদরযত্ন করত। তারা জাহানারার আম্মার কোনো ত্রুটি খুঁজে না পেলেও মনে মনে হিংসে করত। কিন্তু বাহ্যত তাদের বড়বোনের এই সুন্দরী সতীনের সদয়-সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার তাদেরও মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করত। তারা জাহানারার আম্মার প্রশংসা করে না বেড়ালেও যত্রতত্র তার নিন্দা করত না। নিন্দা করত না কারণ নিন্দা করার প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছু ছিল না বলে। তাছাড়া পাড়া প্রতিবেশী, গাঁয়ের গরীব বৌঝিরা তার দয়ামায়ার কথা সবসময়ই বলাবলি করত। আম্মার মৃত্যুর পর বড় আম্মা তার গুণের কথা বলতে থাকেন এবং তার কথা উঠলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

জাহানারার মনে হয় তার বড় আম্মার চেহারাটা ঠিক যেন রাণী ভিক্টোরিয়ার মত। রূপোর টাকায় মুকুটপরা মহারাণীর যে ছবি আছে সে আদলটা যেন বড় আম্মার মুখে কেউ হুবহু বসিয়ে দিয়েছে। যদিও এটা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ নয়। এখন রূপোর টাকায় মহারাণীর মুখ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তার বদলে এ্যাম্‌পারার জর্জ সিক্সথ্ এসে জুড়ে বসেছেন। তবুও পঞ্চম জর্জ ও রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ আঁকা রূপোর মুদ্রা জাহানারা তার আম্মার পুরনো জিনিসপত্র রাখার চন্দন কাঠের বাক্সে অনেক দেখেছে। বড় আম্মার মুখটাকেও তার ঐ ভিক্টোরিয়ার মুখের মতই লাগে।

চাবি হাতে জাহানারা আড়চোখে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে বড় আম্মা হেসে বললেন, 'আমার দিকে হা করে কি দেখছিস। ওদিকে যে লোকজন এক্ষুণি বারান্দায় এসে উঠল বলে?'

'না কিছু না।'

'তৈমুর এখনও দোকান পাট বন্ধ করে ফেরেনি?'

'এতক্ষণে নিশ্চয় এসে গেছে। আমিত আর ওদিকে যাইনি।'

জাহানারা পা বাড়াতে চাইলে বড় আম্মা ডাকলেন, 'শোন।'

জাহানারা থমকে দাঁড়াল, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

'ইসমাইলকে বলবি মেহমানদের ঠিকমত খাইয়ে দিতে।'

জাহানারা বারান্দার দিকে দ্রুত ছুটে গেল।

৩

ডাক্তার নন্দলাল আগত অতিথিদের নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মাঝের কামরার প্রবেশ-দরোজার কালো পর্দাটা একটু দুলে উঠল। জাহানারা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আসুন ডাক্তার চাচা। এ ঘরে কুর্সী দেওয়া হয়েছে।'

'তোমার সকল ভাই-বোনদের হাজির থাকতে বলেছিলাম।'

'আমরা ভাই-বোনরা সকলেই এখানে আছি।'

'জেনানা কেউ থাকতে চাইলে থাকতে পারেন।'

মোল্লা সাহেবের দুই বিবির কথা ইঙ্গিতে বলতে চাইলেন ডাক্তার নন্দলাল।

'আমার বড় আম্মা সবার সামনে বেরুবেন না। তবে তিনি পাশের কামরায় হাজির আছেন। আর ছোটো আম্মা খিড়কিতে দাঁড়িয়েছেন। বড় আম্মা আপনার হাতে সিন্দুকের চাবি দিতে বললেন। এই নিন সিন্দুকের চাবি।'

জাহানারা সসংকোচে চাবিসহ হাতটা বাড়াল। দুধের মত ফর্সা হাত। প্রায় আট গাছা সোনার বাতানা ঝলমলিয়ে উঠেছে। প্রবাল বসানো টকটকে সোনার আংটি একটা মাঝের আঙুলে। পরিচ্ছন্ন করে কাটা ঈষৎ রক্তাভ নখ।

জাহানারার স্বামী কপাটের এপাশে দাঁড়িয়েছিল। সে হাত বাড়িয়ে দ্রুত চাবির গোছাটা নিয়ে ডাক্তার বাবুকে এগিয়ে দিল, 'এই নিন চাচা।'

ডাক্তার নন্দলাল চাবির গোছা হাতে নিয়ে বললেন, 'ফাদার জোনস্, আপনি এদের নিয়ে আগে ভেতরে যান।'

জোনস্ বিহারী বাবুর দিকে তাকালেন।

বিহারী বাবু বললেন,'চলুন আমরা সবাই ত আছি। মোল্লা সাবেবের সাথে সারা জীবন বিলবাওর নিয়ে কত মামলা-মোকদ্দমা করলাম, কত ঝগড়াঝাটি। আজ এবাড়িতে পা দিয়েই মনে হচ্ছে সবি মিথ্যে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আজ ত সবি ফেলে রেখে শূন্য হাতেই বিদায় নিলেন। ভগবান তার মঙ্গল করুন। চল তো তৈমুর, কোথায় যেতে হবে।'

'আসুন চৌধুরী মশায়, এ ঘরেই তার সিন্দুক।'

তৈমুর দরজার পর্দা উঁচু করে ভেতরে যাওয়ার পথ করে দিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের গুটিকয়েক গণ্যমান্য লোক মোল্লাবাড়ির অন্দরে প্রবেশ করলেন। ঘরটা বিশাল। পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে মেহ্‌গনির পালংক পাতা। কারুকার্যময় হাশিয়া। বাহুগুলোতেও ময়ূরের প্রতীক। খাটে ধবধবে বিছানা পাতা। বেতের সেন্টার টেবিলের ওপর রূপোর ফুলদানীতে বাড়ির বাগানের কিছু তাজা ফুল ও পাতা জাহানারা সাজিয়ে রেখেছে। বিশাল কাঠের আলনার ওপর দিকে দেয়ালে দুই জোড়া হরিণের শিং। তারও ওপরে সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই করা সম্রাট পঞ্চম জর্জের পোট্রেট। আর পূর্বদিকের দেয়াল জুড়ে মাথা-সমান উঁচু লোহার অতিকায় সিন্দুক।

তৈমুর অতিথিদের বসতে ইঙ্গিত করলে সকলেই চেয়ারগুলোতে আসন নিলেন। ডাক্তার নন্দলাল বললেন, 'আপনারা অনুমতি দিলে আমি সিন্দুকটা খুলি।'

'আরে ডাক্তারবাবু এতে আমাদের পারমিশনের কি আছে! আমরা ত সবাই মোল্লা সাহেবের বন্ধু, এখানে হাজির আছি। প্লিজ ওপেন ইট!'

বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েরা মেঝেয় মোড়া পেতে বসেছিল। ডাক্তারবাবুকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়াল। জানালায় মুখ বাড়িয়ে আছেন ছোটো বিবি ও আনোয়ারা। আমজাদ সিন্দুকের ডালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে যাতে লোহার ঢাকনা সরানোমাত্রই ভেতরের সবকিছু তার নজরে আসে। জাহানারা তার স্বামী তৈমুরের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তারবাবু সিন্দুকের ডালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরানো মাত্রই ক্লিক করে একটা শব্দ হল। শব্দটাই জানান দিল তালা খুলে গেছে। ডাক্তারবাবু ডালা ধরে টানলেন কিন্তু এই অতিকায় লোহার ঘরের কপাট তার মোলায়েম আকর্ষণে একটুও ফাঁক হল না।

তৈমুর এগিয়ে এসে বলল, 'একটু জোরে টানতে হবে ডাক্তার কাকা। নিরেট লোহার তৈরী কপাট। বিলেতে অর্ডার দিয়ে আমার শ্বশুর সিন্দুকটা বানিয়েছিলেন। ভয়ানক ভারী আর মজবুত। আপনারা ইযাযত দিলে আমি ডালাটা সবার সামনে ধরতে পারি। সাধারণত দরকারে আমার শ্বশুর আমাকেই সিন্দুকটা খুলতে বলতেন। আমি এটা খোলার কায়দা জানি।'

'তাহলে তুমিই ডাক্তারবাবুকে সাহায্য কর।'

বললেন কৃষ্ণনগরের জমিদার বিহারী বাবু।

তৈমুর ডালা ধরে একটা হেঁচকা টান দিতেই লোহার পাল্লাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল। অনেকগুলো খোপে ভর্তি বৃটিশ সিন্দুক। ভেতরটা ঝকমক করছে। পাল্লার বিপরীত দিকে ইউনিয়ন জ্যাক আঁকা। আর প্রতিটি খোপের ডালায় বৃটিশ

মুকুটের তাম্রখচিত মনোগ্রাম। প্রধান খোপ বা কম্পার্টমেন্টটা বেশ বড়। সম্ভবত এর ভেতরেই আছে জুয়েলারী।

তৈমুর বলল, 'এই বড় চাবিটা হল বড় খোপের।

তৈমুর চাবি ঘোরাল। ডাক্তারবাবু ডালা টানলেন। খোলা মাত্রই মূল্যবান হীরে জহরত বসানো জড়োয়ার জেল্লায় দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। জাহানারা এগিয়ে এসে একটু কাত হয়ে ভেতরটা দেখতে চাইলে তৈমুর সরে দাঁড়িয়ে তাকে জায়গা করে দিল।

'এ সবি ডাক্তার কাকা আমার মায়ের।' জাহানারা মুহূর্তের জন্য একবার উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল, 'আমি জানতাম না, একটু আগে আমার বড় আম্মা বললেন, 'এগুলো নাকি কেবল আমার মরহুম আম্মাই পাবে। কেবল তার ছেলেমেয়েরাই এর দাবী করতে পারবে। আমার সৎ মায়েরা বা সৎ ভাইদের মধ্যে এর বন্টন হবে না। বড় আম্মা বললেন তার নিজের অলংকারপত্র তার নিজের হেফাজতেই আছে। আমার ছোটো আম্মাও তারগুলো তার কাছেই রেখেছেন।'

জাহানারার কথায় কোনো সংকোচ নেই। সে নিজেদের প্রাপ্যটা আগেই পরিষ্কার করে নিল।

জাহানারার কথা শুনে আমজাদ এক রকম হুমড়ি খেয়েই সিন্দুকের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে গয়নার পরিমাণটা আন্দাজ করতে চাইল, 'এর ভেতর কাগজপত্র যেন কি আছে?'

ডাক্তারবাবু এবার নিজেই হাত বাড়িয়ে ভেতর থেকে লাল মলাটের একটা খেরোখাতা বের করে আনলেন। খাতার ওপর হলদেটে একটা কাগজ সাঁটা। কাগজে লেখা আছেঃ শ্রীমান আমজাদ আলীর পড়ার খরচের সম্বাৎসরিক হিসাব। আমজাদও খাতাটা দেখে একটু স্তম্ভিত ও দিশেহারা ভাব দেখাল। কিন্তু মুখে কিছু না বলে তৈমুরের দিকে তাকালে তৈমুর সহসাই বলে বসল, 'শুনুন দুলামিয়া, ভাববেন না ও খাতাটা আমি লিখে রেখেছি। এটা আমার শ্বশুর নিজেই লিখতেন। বলতেন, বিয়ের সময় নাকি কথা হয়েছিল আপনাকে পড়ার করচ বাবদ প্রতিমাসে আড়াই শ' করে টাকা কলকাতায় আপনার হোস্টেলের ঠিকানায় পাঠানো হবে। কিন্তু প্রতি মাসেই আপনি চিঠি লিখে যে বাড়তি টাকা চাইতেন সেটার হিসেব আমার শ্বশুর স্বয়ংই রাখতেন। আমাকে রাখতে বলতেন না। মানি অর্ডারও পোস্ট অফিসে গিয়ে নিজেই করতেন। আমরা জানি না আপনাকে মোট পড়ার খরচ বাবদ কত টাকা পাঠানো হয়েছে। সম্ভবত এটা সেই হিসেবের খাতা।'

তৈমুরের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা টের পেয়ে আমজাদ একেবারে চুপসে গেল।

বিহারী বাবু বললেন, 'এ খাতাটা ডাক্তার বাবু আপনিই রাখুন, কারণ এ নিয়ে পরে ফ্যাসাদ হবে। মোল্লা সাহেবের ছোটো মেয়ের জামাই যদি প্রাপ্যের অধিক অর্থ নিয়ে থাকেন তবে সেটাও বন্টনের সময় বন্টনকারীদের বিবেচনা করে দেখতে হবে বৈকি।'

এ কথায় আমজাদ একেবারে লা জওয়াব। আনু জাহানারার পাশে এসে মাথায় কাপড় দিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আমজাদ নিজেই খাতাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছে দেখে সে মুখ খুলল, 'বুবু, তোমাদের জামাইকে বল সিন্দুকের কাছ থেকে সরে আসতে। এটা আমাদের পারিবারিক বিষয়, এদেশের মুরুব্বীরা সবাই এখানে আছেন। তারাই সয়সম্পত্তির ব্যাপারে ইনসাফ করবেন।'

আনুর কথায় আমজাদ নিঃশব্দে সিন্দুকের কাছ থেকে সরে এল, 'না না, আমি তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে গেলাম কখন? শহরের মুরুব্বীরা এখানে আছেন বলেই তো আমি এখানে এলাম।' বলে আমজাদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে কেউ থাকতে আহ্বান করল না।

জাহানারা এভাবে আমজাদের পালিয়ে যাওয়ার কারণটা আন্দাজ করলেও বোনকে বলল, 'ওকে কেন ওভাবে কথা বললি? ও থাকলে কার কি অসুবিধে ছিল? এখন কি না কি ভেবে বসে!'

'ভাবুক, সবকিছুতেই ওর থাকা আমি পছন্দ করি না বুবু। ও কেন ভাবে তোমরা আমাকে ঠকাচ্ছ?'

জাহানারা ফিসফিস করে বোনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'কাজটা বোধ হয় ভাল হল না। এ নিয়ে পরে তোকে খোঁটা শুনতে হবে, দেখিস।'

'কি খোটা দেবে তোমাদের জামাই? দেখলে না ওর নামের হিসেবের খাতাটা দেখেই ঘাবড়ে গেল? লেখাপড়ার নামে ও কি আমার আব্বাকে কম জ্বালিয়েছে? ওর ধারণা, ওসবের হিসেব বুঝি কেউ জানে না, কিন্তু আমরা তো জানি বুবু, আব্বা ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন, নিজে কষ্ট করে বড় হয়েছিলেন। একটা পাইও বিনা হিসেবে কাউকে দিলে তা লিখে রাখার তার অভ্যেস ছিল। খাতা দেখে সে পালিয়েছে। পালাক, টাকা টাকা করে আর বাপের বাড়ির হিস্যা আদায়ের জন্য ও আমাকে আব্বার ইন্তেকালের কয়েক বছর আগ থেকেই জ্বালিয়ে এসেছে। ঝাঁটা মারি অমন শিক্ষিত জামাইয়ের কপালে!'

জাহানারা বোনের মুখের ওপর হাত চেপে ধরে বলল, 'থাম তো আনু, তোর কি হয়েছে?'

আনু চুপ করে মাথা নুইয়ে ফেলল।

ততক্ষণে সিন্দুকের সবগুলো খোপের জিনিসপত্র, দলিল দস্তাবেজ ও টাকা-কড়ি ডাক্তার নন্দলালের নির্দেশে তৈমুর বের করে এনে সকলের সামনে একটা শ্বেতপাথরের টেবিলে সাজিয়ে রাখছে।

ডাক্তার বাবু বললেন, 'আর কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না বিহারী দা। তবে মোল্লা সাহেবের লেনদেনের মোটামুটি একটা ধারণা সিকান্দার রাখে। যদি মোল্লা সাহেবের কাছে কারো কোনো পাওয়া থাকে কিংবা তিনি কারো কাছে কিছু ধেরে থাকেন সেটা শহরে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলেই হবে।'

'ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ডাক্তার কাকা, কেউ এখন পর্যন্ত কোনো দাবী নিয়ে আসেনি।'

এ ব্যাপারে মুরুব্বীদের নিশ্চিন্ত করল তৈমুর।

বিহারী বাবু কি ভেবে যেন বললেন, 'একটা কথা পরে ভুলে যাব বলে আগেই আপনাদের কাছে প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। আমি মোল্লা সাহেবের কাছ থেকে গত দাওয়া কাটার সময় এক হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম। নগদ টাকার খুবই দরকার হওয়ায় আমি ধারটা চেয়েছিলাম। তিনি খুশী মনেই দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো তাগাদাও দেননি। এখনই ঋণটা স্বীকার না করলে অধর্ম হবে ভেবে বিষয়টা আপনাদের জানালাম।'

জমিদার বাবুর কথায় কেউ কোনো শব্দ করল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রায় সকল মানুষই জানত, শহরের এই দুই বিত্তবান ব্যক্তির মধ্যে কোনো সুসম্পর্ক কোনো কালেই ছিল না। সব সময় এদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা লেগেই থাকত। এখন বোঝা গেল বাহ্যত এদের মধ্যে একটা রেষারেষি সব সময় লেগে থাকলেও বিপদে-আপদে এরা পরস্পরের সাহায্য ও লেনদেনে মোটেই কুণ্ঠিত ছিলেন না।

তৈমুর হঠাৎ নীচের দিকের একটা খোপে চাবি লাগিয়ে ডাক্তার নন্দলালের দিকে চোখ তুলে হাসল, 'এতে ক্যাশ টাকা রয়েছে ডাক্তার কাকা।' বলেই সে চাবী ঘোরাল, 'বের করব?'

ডাক্তার বাবু মাথা নেড়ে ইঙ্গিত দিতেই তৈমুর ভেতর থেকে ধাতুর কয়েনের বিশাল দু'টি থলে প্রথম টেনে বের করল, 'এ দুটোতে কেবল রূপোর টাকা রয়েছে। দুটোতে মোট হাজার পাঁচেক হবে।'

'তুমি তো তাহলে টাকা-কড়ির ব্যাপারে সবি জানো দেখছি?'

বললেন ফাদার জোনস্।

'জি ফাদার, আমি টাকা-পয়সা যা আমার শ্বশুর নগদ রাখতেন তা জানি। কারণ নগদের গোণাগুণতি তিনি আমার হাত দিয়েই করাতেন। রাখতামও আমিই।'

তৈমুর স্বীকার করল নগদ অর্থের ব্যাপারটা তার অজানা নয়।

'নোটের তাড়া তো দেখছি না?'

প্রশ্ন করলেন জমিদার বিহারী লাল চৌধুরী।

'তাও আছে, বের করব?'

'হ্যাঁ, সবি দেখাও। আমরা তো দেখতেই এসেছি।'

ডাক্তারের কথায় তৈমুর ভেতরে হাত দিল।

'এই এখানে বিশ হাজার টাকা, সবি একশ' টাকার কারেন্সী নোট।'

তৈমুর কাগজে মোড়ানো একশ' টাকার নোটের পাঁচটি বান্ডিল বের করে সামনে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। জমিদার বাবু অবাক হয়ে বান্ডিলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ তো অনেক টাকা ডাক্তার বাবু। এত টাকা সম্ভবত এতদঞ্চলের কোন ব্যবসায়ী কিংবা জোতদার-জমিদারের নেই। মোল্লা সাহেব এত টাকা কোত্থেকে যে নগদ পেলেন তা আমার ভাবনায় আসছে না।'

তিনি একটু হাসার চেষ্টা করলেন। তার চোখে-মুখে একটু ঈর্ষাকাতরতার ছাপ স্পষ্টতই ফুটে উঠল। ফাদার জোনস্ ব্যাপারটা আন্দাজ করে বললেন, 'আমি জানি মোল্লা এ টাকা কোত্থেকে পেলেন এবং কেন সিন্দুকে জমা রেখেছেন।'

'আমিও জানি।'

পেছন থেকে কথা বলল সিকান্দার। মোল্লা সাহেবের খেত-খামারের ভাগচাষী, মরহুমের সর্বসময়ের সঙ্গী।

'এ টাকা গত আড়াই বছরে মোল্লা পাটের ব্যবসায়ে নারায়ণগঞ্জের পাটের বৃটিশ আড়তদারদের থেকে লাভ করেছেন। কয়েকদিন আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি এবারের মওসুমে লাখপতি বনে যাবেন। এখন নাকি তার গুদামে নিজের ও অন্যের কাছ থেকে কেনা দু'হাজার মণ কাঁচা পাট মজুদ আছে। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন, আমার ফ্রেন্ডের বাসনা পূরণ হল না। আমি খুবই দুঃখিত।'

ফাদার জোনস্ বন্ধুর জন্য আক্ষেপ প্রকাশের সাথে সাথে মোল্লা সাহেবের জমা টাকার উৎসের আসল হদিস দিলেন। এতে জমিদার বিহারী বাবুর চোখে সহসা এক ধরনের লোভের আলো খেলে গেল।

'নারায়ণগঞ্জের চটের মিলের সাহেবদের সাথে আপনিই ত মোল্লার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যতদূর জানি সাহেব সুবেরা এদিকে এলে ত মিশনে

আপনার অতিথি হয়েই থাকেন।' ইঙ্গিতময় হাসি হাসলেন জমিদার বাবু, 'আমাদের দিকেও একটু নজর দেবেন ফাদার। জমিদারীর ওপর তো একালে আর ভরসা রাখা যাচ্ছে না।'

বিহারী বাবুর কথায় মৃদু হাসলেন ফাদার জোনস্, 'আপনারা তো প্রজার ওপর জুলুমটিই ভাল বোঝেন চৌধুরী বাবু, ব্যবসায় আপনাদের কাজ নয়। মোল্লা সাহেবও বড় জমিদার ছিলেন। তিনি জমির ওপর ভরসা ছেড়ে আমার কথায় পাটের ব্যবসা ধরলেন আর লাল হয়ে গেলেন। বাঙালিদের এমন ব্যবসাবুদ্ধি আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। তিনি যেমন দিতে জানতেন, তেমনি নিতেও জানতেন। আমাদের গীর্জার জন্য জমিটা তিনি এক কথায় দিয়ে দিলেন।' বিস্মিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল ফাদারের মুখে, 'আমরা সাহেব হই আর নেটিভ খৃস্টান, এই উদারতার কথা আমরা কোনদিন ভুলব না। তিনি নেই, তার ছেলে-মেয়েরা যাতে দাঁড়াতে পারে সেটা আমরা লক্ষ রাখব। এটা আমার প্রমিজ।'

৪

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে বাদশা মোল্লার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটা হিসেব হল। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানদের মধ্যে যারা মোল্লা সাহেবের বন্ধু বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তারাও তার বিপুল বিত্তের পরিমাণটা প্রথমে আন্দাজ করতে পারেননি। এখন সকলেই বিস্মিত। মোল্লা প্রথম জীবনে যে খুব সচ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন তার সুহৃদ কিংবা বিপরীতরা তা স্বীকার করেন না। প্রথম জীবনে তিনি কিছু জোত-জমির মালিক ছিলেন বটে, কিন্তু তার স্বভাব চরিত্র খুব একটা প্রশংসনীয় ছিল এটা কেউ স্বীকার করে না। শোনা যায় যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি আফিমের নেশায় আসক্ত ছিলেন এবং বাজারের খারাপ পাড়ায়ও তার যাতায়াত ছিল। তবে তার পরিবার ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল ধর্মীয় পরিবার। অতি প্রাচীনকালে নাকি এ পরিবার ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এতদঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। সুলতানী আমলের গোড়ার দিকে সম্ভবত এরা পাঠান সুলতানদের সৈনিকবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু নিজেরা পাঠান ছিলেন না। এরা মধ্যপ্রাচ্য কিংবা পারস্যের অতি দরিদ্র যাযাবর শ্রেণীর আলেম সমাজেরই উত্তরাধিকারী হবেন। এরা মহাদেশগুলোতে ইসলামের দিগবিজয়ী বাহিনীর পশ্চাৎ অনুসরণকারী হাফেজ ও ক্বারীর বংশ। যার যেখানে

খুশী এরা ছুটে বেড়াতো দেশ-দেশান্তরে। খেলাফতের পতনের পর এরা মুসলিম রাজা-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার আশায় হিন্দুস্তানেও প্রবেশ করে এবং বাংলার ভাটি অঞ্চলের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে নওমুসলিমদের কাছে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের পবিত্র কোরআন হাদিস শিক্ষাদান এবং শরিয়তের আদব-লেহাজ শিক্ষা দেয়ার জন্য ধীরে ধীরে দুয়েক ঘর করে থেকে যেতে থাকে। হিন্দুস্তানে মুসলিম বাদশাহ্ ও আঞ্চলিক আমীর ওমরা ও নবাবদের পতনের পর এরাই ধর্ম হিসেবে ইসলামের খেদমতে নিজেদের বিলিয়ে দেয়। এরা ইংরেজী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিল। এদের দৃঢ় আশা ছিল হিন্দুস্তানে মুসলিমরা পুনর্বার অচিরেই তাদের হৃত রাজ্য ও গৌরব পুনরুদ্ধার করবে। কিন্তু তাদের সে বাসনা নানা কারণেই ফলবতী হয়নি। তবে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলিম অভিজাতদের, বিশেষ করে কৃষিনির্ভর জোত-জমির মালিকদের পেছনে ফেলে এগুতে থাকলে এদের টনক নড়ে। পরে দেখা যায়, ঐ আলেম ওলামাদের সন্তানরাই মাদ্রাসা শিক্ষার সীমা পেরিয়েও ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। ততদিন দেড় শতাব্দী পার হয়ে যায়।

বাদশা মোল্লার পরিবারও তেমনি একটি পরিবার। বৃটিশ শাসনের প্রতি হঠাৎ এদের মানসিক আনুগত্য বাড়ার ফলে পরিবারের ভেতর ইসলামী শরিয়তের বাঁধন স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা শিথিল হতে থাকে। মোল্লা সাহেব ছিলেন সেই শিথিলতা যুগেরই সন্তান। প্রথম জীবনে কঠোর নৈতিকতার শাসন তিনি মানেননি কিংবা বলা যায় মানতে পারেননি। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সবচেয়ে প্রশস্ত সড়ক ও বাজার– আনন্দ বাজারের এক মুসলিম কাপড় ব্যবসায়ীর গোমস্তা হিসেবে জীবন শুরু করেন। বাজারই ছিল তার প্রথম যৌবনের ধ্যানজ্ঞান। বাজারেই তিনি দিবানিশি থাকতেন এবং তার শত্রুদের ধারণা বাজারের খারাপ পাড়ায়ও তার যাতায়াত ছিল। সম্ভবত সেখান থেকেই আফিমের নেশা ও অর্থের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আসক্তি লাভ করেন।

নিজের অপরিসীম অধ্যবসায় এবং সৌভাগ্যের ফলেই বাদশা মোল্লা পরবর্তী জীবনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের একজন ধনী ও মান্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। যে দোকানে তিনি একদা একজন সামান্য দোকান কর্মচারী ছিলেন, সেই দোকানের মালিকের মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা দোকানটি বিক্রি করে দিতে চাইলে বাদশা মোল্লা নিজের সামান্য জমিজমা বন্ধক রেখে দোকানটা কিনে নেন। এরপর থেকেই শুরু হয় তার সৌভাগ্যের সূচনা। ভাগ্যের সুফল ফলতে শুরু করলেই অন্যান্য মুসলমান সচ্ছল ব্যক্তির মত তাকে মাটির নেশায় পেয়ে বসে। তিনি

জমি কিনতে শুরু করেন। তিতাস নদীর এপার ওপার যত ধানী জমি, খিলখেত, চারণভূমি ও চর কেনাবেচা হত, সবই তিনি ধীরে ধীরে কিনে নিতে লাগলেন। তাছাড়া ছিল সরকারী নিলাম ও বন্দোবস্তের ডাক। ঐ সব ডাকে পুনিয়টের খাঁদের, কৃষ্ণনগরের জমিদার পরিবারের লোকদের, বংশী মাস্টারের মত ঘোষপাড়ার বড় জোতদারদের তিনি কলা দেখিয়ে একে একে সরকারের মাইল মাইল বিস্তৃত খাস জমি ও পশুচারণ ভূমিগুলো কিনে নিতে থাকেন। তার পূর্বপুরুষেরা যাযাবর আলেম শ্রেণীর মানুষ হলেও, তাদের রক্তে যে সামন্তবাদের আদব-লেহাজ-লোভ ও গৌরব ছিল, বাদশা মোল্লার স্বভাবের মধ্যেও তা সংগুপ্ত ছিল। তার মাটির ক্ষুধা ছিল অপরসীম। অল্পকালের মধ্যে তার জোতজমির পরিমাণ তাকে স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের প্রায় সমকক্ষ করে তুলল। শত্রুতা ও ঈর্ষা বৃদ্ধি পেল। শুরু হল জোতজমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা। এসব করার জন্য ক্ষুরধার বুদ্ধি আর লোকবল দরকার। বাদশা মোল্লার লোকবল অর্থাৎ লাঠিয়ালের অভাব হল না। কারণ, স্থানীয় মুসলমান চাষী ও ভূমিহীনরা এতকাল হিন্দু জমিদার জোতদারদের শোষণ-পেষণে জর্জরিত ছিল। তারা সকলেই বাদশা মোল্লার পক্ষে এসে দাঁড়াল। মৌড়াইল গাঁয়ের লাঠিয়ালদের ভয়ে সারা শহর তখন কম্পমান। আঞ্চলিক বিবাদ-বিসম্বাদের ফয়সালার জন্য শহরের বা এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির মত বাদশা মোল্লাকেও এখন আর না ডাকলে চলে না। অল্পকালের মধ্যেই মোল্লা সাহেবের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সুবিচার ও ইনসাফের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শক্তি ও সুবিচার তাকে ক্রমাগত ওপরের দিকে ঠেলতে থাকে। কিন্তু যে বিদ্য ও বুদ্ধির জোরে হিন্দু জমিদাররা বাদশা মোল্লাকে তাদের শ্রেণীভুক্ত করতে অসম্মতি জানাতে থাকে সেটা হল শাসক শ্রেণীর সাথে তাদের সম্পর্ক এবং ইংরাজী শিক্ষার বাহাদুরী। লাঠি ও অর্থের জোর থাকলেও মোল্লা সাহেবের পরিবারে ইংরাজী শিক্ষিত কোনো সদস্য ছিল না। এ অভাব পূরণের লক্ষ্যে তিনি মেয়েদের জন্য ইংরাজী শিক্ষিত ছেলে খুঁজতে থাকেন। এতে তিনি যে খুব একটা সফল হয়েছিলেন তা মনে হয় না। তবুও তিনি যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি তা তার বন্ধুরা সবাই জানত। ইংরাজী না জানার ফলে হিন্দু জমিদারদের মত শাসক শ্রেণীর সাথে দহরম মহরমের জন্য কলকাতা, দিল্লী কিংবা ভারতের অন্য কোথাও বিচরণ তার সম্ভব ছিল না। কলকাতায় নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি কোনো বাড়ি নির্মাণ করেননি। তিনি জানতেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু জমিদারদের ছেলেরা কলকাতায় শিক্ষাদীক্ষার নামে কেবল লাম্পট্য করে বেড়ায়। তার ছেলেদের জন্য এ ধরনের উচ্ছৃঙখল জীবন তিনি পছন্দ করতে পারেননি। অবশ্য তার ছেলেরাও ছিল তার

পড়ন্ত বয়সের সন্তান। তার মেয়েরাই ছিল তার প্রথম যৌবনের সন্তান। মেয়েদের তিনি ইংরাজী শিক্ষা না দিতে পারলেও মূর্খ রাখেননি। সকলেই প্রথাগত শিক্ষায় অল্পবেশী শিক্ষিত। মেয়েরা স্থানীয় মিশনারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সকলেই স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোতে পাঁচ-ছয় বছর পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিল। তবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মোল্লা সাহেব উপযুক্ত পাত্র দেখে তাদের বিয়ে দিয়ে দেন। তার অন্য জামাতারা সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত। তবে বড় মেয়ে জাহানারাকে তিনি বিয়ে দেন নিজের ভাইয়ের বেটা তৈমুরের সাথে। তৈমুরের লেখাপড়ার দৌড় প্রবেশিকা পর্যন্ত হলেও তার অন্যান্য গুণ মোল্লা সাহেবকে আকর্ষণ করে। সে চাচার ব্যবসায়-বাণিজ্যে কিশোর বয়েস থেকে সাহায্য করে এসেছে এবং মোল্লা সাহেবের খুবই বিশ্বস্ত। মোল্লা সাহেবের দোকানদারীর চেয়ে জমিজমার দিকেই প্রথম জীবনে লক্ষ্য ছিল বেশী। কিন্তু তৈমুর তার কাপড় ও জুতার ব্যবসাকে এমনভাবে জাঁকিয়ে তোলে যে নগদ টাকায় সিন্দুক ভরে যায়। তাছাড়া জাহানারা ও আনোয়ারার এক জ্যেষ্ঠা বোনকে তিনি স্থানীয় একজন ইংরেজী শিক্ষিত ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে ঠকেছেন। ঠকেছেন অবশ্য ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে। শ্বশুরের খরচে ছেলেটি বিলেতে পড়তে গিয়েছিল। মোল্লা সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোয়ারা তখন সন্তানসম্ভবা। সন্তান প্রসবকালে নবজাতকসহ মনোয়ারা ইন্তেকাল করে। কিন্তু মানবতার খাতিরে মোল্লা প্রবাসী জামাতার পড়ার খরচসহ প্রবাসকালীন যাবতীয় ব্যয় চালিয়ে যান। ছেলেটি উচ্চ শিক্ষা শেষ করে এসে শ্বশুরের কাছে তার অন্য যে কোনো একটি মেয়েকে গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু মোল্লা সাহেব কি ভেবে যেন শেষ পর্যন্ত অসম্মত হন। উচ্চ শিক্ষিত জামাইটি মুক্তি পেয়ে অন্যত্র বিয়ে করে।

এর মধ্যে নিজের এবং পরিবারের ইংরেজী শিক্ষার অভাবে শাসক শ্রেণীর সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তোলা তিনি একান্ত দরকার মনে করেও করতে পারেননি, তা পূরণ করার এক মূল্যবান সুযোগ জুটে যায়। স্থানীয় খৃস্টান মিশনের প্রোটেস্ট্যান্ট ফাদার মিঃ জোনস্ পাকা গীর্জা, মিশন স্কুলের পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণের প্রয়োজনে এক খন্ড উপযুক্ত জমির জন্য বাদশাহ্ মোল্লার শরণাপন্ন হলে তিনি এক কথায় ফাদারকে প্রায় পাঁচ বিঘার মত জমি বিনামূল্যে দান করে দেন। এতে মিঃ জোনস্ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং মোল্লা সাহেবের সাথে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। ফাদারও চেষ্টা করতে থাকেন কিভাবে এই প্রভাবশালী মুসলিম ভূস্বামীকে তার আওতার মধ্যে সাহায্য-সহায়তা করতে পারেন। মওসুমের সময় নারায়ণগঞ্জের চটকলের মালিকরা আশুগঞ্জের দালালদের সাহায্যে পাট কেনার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এলে খৃষ্টান মিশনে অবস্থান

করত। ফাদার এ সুযোগ গ্রহণ করে বাদশাহ্ মোল্লাকে কাঁচা পাটের ব্যবসার দিকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ইংরেজ চটকল-মালিকদের কাছ থেকে আগাম বিপুল অর্থ মোল্লাকে নগদ হাতে ধরিয়ে দিয়ে পাটের ব্যবসায়ে নামিয়ে দেন। মোল্লার মাটির মোহ ছুটে গিয়ে এক অকল্পনীয় ব্যবসায়িক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মবাড়িয়ার সবচেয়ে ধনী, শাসক শ্রেণীর সবচেয়ে অনুগত এবং এলাকাবাসী মুসলমানদের কাছে একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

রাতে মাঝের ঘরটায় আনু তার ছেলেমেয়ে ও স্বামীসহ্ শুয়েছে। বাড়িটা এখন একটু নিস্তব্ধ। রাত এগারোটা। একটু আগে বাড়ির মুনিমানুষ ও কাজের মেয়েরা যাদের রাতের বেলায় অন্দরে থাকার অনুমতি নেই, যাদের বাড়ি আশেপাশেরই কোনো গাঁয়ে কিংবা মৌড়াইল গাঁয়েরই পশ্চিম দিকের পাড়া-বস্তিতে, তারা সকলেই রাতের খাওয়া খেয়ে কিংবা পুটলিতে বেঁধে গেটেরই বাইরে চলে গেছে। ফলে বাড়িটা এখন নিঃশব্দ। তবে মোল্লাদের এই নতুন বাড়িটা খোলা মাঠের মধ্যে হওয়ায় শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। দলবেঁধে ডাকছে শিয়ালগুলো। দু'একবার সম্মিলিত হুক্কাহুয়ার পরই বাড়ির কুকুরগুলো জবাবে মহাচেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। এ বাড়িতে শখ করে কেউ কুত্তা পোষেনি। এমনিতেই কোত্থেকে যেন এসে জুটেছে। থাকে অন্দরের বারান্দায়। বিশাল বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে পর্যন্ত কুকুরের দাপানি ও ছোটাছুটির শব্দ শুনে আমজাদ আনুকে ডাকল, 'এই শুনছো?'

'শুনছি। বাড়িতে ডাকাত পড়েনি আমি জানি। শেয়াল ডাকল কুত্তাও ভোঁকে।'

'গয়নাগাটির কিছু অংশ তুমি পাবে না?'

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় না হলেও এ মুহূর্তে আমজাদ যে এ প্রশ্ন করবে আনু তা আন্দাজ করতে পারেনি।

'আমি ভেবেছিলাম শেয়াল আর কুত্তার ডাকে বুঝি তোমার ঘুম ছুটে গেছে। তুমি তো আসলে আমার মরা মায়ের জড়োয়া গয়নাগুলোর ডাকে ঘুমোতে পারছো না।' আনু স্বামীর দিক থেকে পেছন দিয়ে পাশ ফিরল, 'এখন ঘুমোও। আমার আত্মীয়-স্বজন অবিবেচক নন। আমার প্রাপ্যটা আমি পাব। তবে তোমার অতিরিক্ত টাকা নেয়ার বিষয়টা ভাগের সময় উঠবে। তুমি, আল্লাই জানেন কি পরিমাণ নিয়েছে?'

'এখন টাকার কথা রাখ, এদিকে একটু ফেরো না। মুখ ঘুরিয়ে নিলে কেন?'

আনুর বাহুমূল আকর্ষণ করে আমজাদ জবাব দিল। তার গলা একটু কামনা-কাতর।

আনু পাশ ফিরতেই আমজাদ তাকে বুকের ভেতর টেনে আনল, 'গয়নার একটা ভাগ তোমার চাই। যেভাবেই হোক আদায় করবে।'

'আদায়ের প্রশ্ন আসে কেন? আমার মায়ের জেওর আমি এমনিতেই কিছু পাব। যদিও আমার বিয়ের সময় আমার আম্মা বিশ ভরির ওপর সোনাদানায় আমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সবি তো আমার আছে। না পেলে আফসোস কেন?'

আমজাদ সহসা থমকে গেল, 'এসব কি বলছ আনু? মায়ের স্মৃতিচিহ্ন তোমার কাছে কিছু থাকবে না?'

'দেখো, আনু স্বামীর লোভী কণ্ঠস্বরের আভাস পেয়েই ঠেলে সরিয়ে দিল, 'তুমি এ পর্যন্ত যা নিয়েছ এর কিছুরই আভাস আমাকে দাওনি। কলকাতায় তুমি পড়তে গিয়েছিলে। সেখানে তোমাকে প্রতি মাসে আড়াইশো করে নিয়মিত আব্বা পাঠাতেন। অনেক রাজাগজার ছেলেও মাসে আড়াইশো টাকা পড়ার খরচ পায় না। তারপরও তুমি কেন আব্বার কাছ থেকে টাকা চেয়ে পাঠাতে? নাকি সেখানেও একটা মাগ করে রেখেছো?

'বাজে বকো না। আমি রাজার ছেলে না হই, আমি যাদের সাথে লেখাপড়া করেছি তারা তো সবাই নবাব-জমিদারের ছেলে। সবাই জানে, আমার শ্বশুর ভাটি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী। তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে বুঝলে?'

'তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কত নিয়েছ এর হিসেব যদি না রেখে থাকো, এখন হিসেব হবে। বেশী নিয়ে থাকলে বাটোয়ারার সময় শোধ দিয়ে নিতে হবে।'

আনুর কথায় আমজাদা কতক্ষণ চুপ করে থাকল। সে আর স্ত্রীর দেহের দিকে এগুবার স্ফুর্তি পেল না।

'আমার কিছু টাকা বেশী নেয়ার জন্য তোমার প্রাপ্য থেকে ওটা বাদ যাবে কেন? তোমার বড় বোন আর ভগ্নিপতি যে বছর বছর এ বাড়িতে পড়ে খায়। তোমার বোন কখন কিভাবে কাছে থাকার সুযোগে লুটে নিচ্ছে এটাও তো দেখতে হবে। ফয়সালা করতে হলে সবকিছুই ফয়সালা হওয়া উচিত। এর ওপর এখন এদেশের মুরুব্বীরা তোমার ধড়িবাজ বোন জামাইয়ের ওপরই সবকিছুর ভার দিয়ে গেলেন। বললেন নগদ টাকাকড়ি ও স্থাবর এখন বন্টন হবে না। কেবল অস্থাবর যা কিছু আছে সেটা বন্টন হবে। এর মধ্যে যদি আমার শ্বাশুড়ীর সোনাদানার ভাগও তুমি না পাও, তাহলে আমরা কি কলা চুষবো?

'মায়ের জেওরের অংশ বুবু আমাকে দেবে।'

আনু আবার পাশ ফিরে শোয়ার চেষ্টা করলে আমজাদ তাকে টেনে রাখল, 'মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন?'

'কি বলবে বল?'

'জেওরের অংশ দেবে মানে কি? আমার অতিরিক্ত নেয়ার বিষয়টা আবার উঠবে না তো।'

'বুবু বলেছেন দুলাভাই তা তুলতে দেবেন না আমি বুবুকে বলেছিলাম।'

'বলেছিলে? চমৎকার মেয়ে তুমি, তোমাকে তো আমি এটাই বোঝাতে চাইছিলাম। তোমার বোনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি ঐ অপয়া খেরো খাতাটা গায়েব করে দিতে পারতে তাহলে যে কি ভাল হতো না আনু! কেউ বলতে পারতো না আমি ভাগের চেয়েও বেশী নিয়েছি।'

আনু সবলে নিজের বুকের মধ্যে আর্কষণ করল আমজাদ, 'নিজের স্বার্থের ব্যাপারে যার সাথে যে ব্যবহার করা দরকার তা তোমাকে করতে হবে আনু। নইলে পরে আফসোস করে মরতে হবে।'

আনু স্বামীকে হাত দিয়ে যথাসম্ভব ঠেলে ঠেকিয়ে একটু অভিমানভরা কণ্ঠে বলল, 'এখন অত আদর করছ কি আমার বাপের বাড়ির সম্পত্তির জন্য? শোন, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। এ শহরের গণ্যমান্য লোকেরা আমার নাবালক আপন ও সৎভাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে দোকানপাট, জমিজমা ও নগদ টাকাকড়ি ভাগ বাটোয়ারায় নিষেধ করেছেন। নগদ টাকা ভাগ হয়ে গেলে তৈমুর ভাই দোকান-পাট আর পাটের ব্যবসায় এই মুহূর্তে চালাতে পারবেন না। তিনি যাতে সবকিছু ধরে রাখতে পারেন, অন্তত আমার ভায়েরা মাথা তুলে না দাঁড়ানো পর্যন্ত, সেদিকটা তোমার-আমার বিবেচনা করতে হবে। অধৈর্য হয়ো না। সবি আমি পাব। বিষয় ভাগ হলো না বলে গয়নার ভাগ আমি বুবুর কাছে চেয়েছি। এ ব্যাপারে বুবুকে রাজি করিয়েছি তোমার অতিরিক্ত নেয়ার খাতাটার কথা যেন তৈমুর ভাই এবং বুবু না তোলেন। আমার বোন বিষয়টা চেপে রাখতে তৈমুর ভাইকে রাজী করিয়েছেন। তুমি খালি হাতে এ বাড়ি থেকে যাচ্ছো না।'

'খুবই বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছ।'

আমজাদের গলায় নিরুদ্বিগ্ন খুশীর শব্দ।

'এখন তাহলে বল তুমি কি পরিমাণ অর্থ আব্বার কাছ থেকে নিয়েছিলে? বুবুর জামাই হয়ত বুবুর চাপে বিষয়টা তুলবেন না। তবে নন্দ কাকা আর সিকান্দার চাচার তো তা অজানা থাকবে না।'

আনু এখন ভয় পাচ্ছে যে তার স্বামী হয় এমন বিপুল অর্থ পিতার কাছ

থেকে একটু একটু আদায় করে নিয়েছে, যে টাকার হিসেব হলে এখন তার মূল প্রাপ্য নিয়েই অংশদাররা প্রশ্ন তুলবে।

'বুবুকে বল ওসব এখন একদম চাপা দিয়ে দিতে। তিনি তো তোমার আপন বোন, তিনি ঠিকই পারবেন। আর ওসব ডাক্তার-ফাক্তার আর ভাগচাষীর জানাজানিতে কচু হবে। যা নিয়েছি, নিয়েছি। আমার শ্বশুর পড়ার বাবদ অতিরিক্ত দিয়েছে। ওসব এখন ধামাচাপা দিতে হবে। কত নিয়েছি আমি কি মনে করে রেখেছি নাকি যে আমাকে পরিমাণটা জিজ্ঞেস করছ?

'আমি জানি তুমি বিপুল অর্থ নিয়েছ। কি কথা বলে আব্বাকে বাধ্য করেছিলে তা আল্লাহই জানেন আর তুমি জানো।'

আনু আবার পাশ ফিরল।

৫

পাশের ঘরের অর্থাৎ পশ্চিমের কামরায় জাহানারা তৈমুর প্রাচীন খাটে নতুন তোষক পেতে বিছানা সাজালেও রাত এগারোটা পর্যন্ত বালিশে কেউ মাথা রাখতে পারেনি। একটু আগে বাজারের দোকানপাট বন্ধ করে ক্যাশ মিলিয়ে তৈমুর ফিরেছে। টাকার থলে পাশের ঘরের সিন্দুকে রেখে আসবে- এখন সে উপায় নেই। আনোয়ারা 'ছোটো জামাইকে নিয়ে ওঘরে থাকায় তৈমুর টাকার থলেটা জাহানারার হাতে দিয়ে বলল, 'থাক, ডাকাডাকির দরকার নেই। ক্যাশটা তোমার কাছেই কোথাও সামলে রাখো। এ ঘরের আলমারীতে তালা নেই, আলমারীতে টাকাকড়ি রাখাও বোধ হয় ঠিক হবে না। খাটের শিথানেই বালিশের নিচে রেখে দাও। টাকার থলেটা স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তৈমুর পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতে লাগল,'মাহমুদ এ ঘরে শোবে না?'

তোমার ছেলে এ ঘরে আমাদের সাথে থাকতে চায় না। বলে, আমি আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবো। রাতের খাবার খেয়ে আমার কাছ থেকে চাবী নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।'

'ওবাড়িতে একা থাকতে ওর ভয় লাগবে না।'

'আমিও তো ও কথাই ওকে বললাম। বলে ভয় কিসের, আমার বিছানায় গিয়ে আমি শোব। সব সময় থাকি না? কই ভয় তো লাগে না।'

'আর অমনি ওকে যেতে দিলে?'

'আর ভয়ের কিছু দেখি না, তোমার ছেলে যেন একটু কেমন ধরনের এতটুকু বয়েস থেকেই তো আমাদের বিছানায় থাকতে চায় না। বলে, আমি অন্য ঘরে শোবো। তোমার ছেলের মধ্যে ভয়ডর নেই। সারারাত বাতি জ্বেলে ঠাকুরমার ঝুলি পড়বে, বোঝো না?'

'বুঝি, তবুও একটা খালি বাড়িতে ওকে থাকতে পাঠানো বোধ হয় ঠিক হয়নি। আর গল্পের বই পড়ার যে নেশায় পেয়েছে এতে না আবার ইস্কুলের পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকে।'

তৈমুর পাঞ্জাবীটা খুলে আলনায় রাখল।

জাহানারা ততক্ষণে টাকার থলেটা পালংকের শিথানের তোষক তুলে সামলাতে ব্যস্ত।

'বলে তো এবার ওই ফার্স্ট হবে। উবুড় হয়ে সারা বিকেল আমাদের পুকুর পাড়ের সিঁড়ির ওপর ওসব পড়ছিল বলে ধমক দিয়েছিলাম। হেসে বলল, 'পড়ি তাতে কি? পড়তে নাকি ওর খুব ভালো লাগে। ইস্কুলের পড়ার ফাঁকি হচ্ছে বলায় তোমার ছেলে হেসে বলল, এবার আমিই ক্লাসে ফার্স্ট হব, দেখে নিও। আমি আর কি বলব?'

তৈমুর আর কোনো কথা বলল না।

জাহানারা বলল,'ভাত কি এখানেই বেড়ে আনব, না পাকের ঘরে যাবে?'

'যাও। হাত মুখ ধুয়ে আসছি।'

জাহানারা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে তৈমুর দুয়ার ভেজিয়ে ঘাটলার দিকে চলল।

খাওয়ার পর দু'জনই খাটে এসে শুয়ে পড়ল। গায়ে লেপ তুলতে তুলতে তৈমুর বলল, 'চাচা যে ব্যবসা-বাণিজ্য এভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন তা যদি আগে জানতাম তাহলে এ পরিবারের হাল ধরার দায়িত্বটা আমি নিতাম না। অথচ দেখো তার কায়কারবারে আমি আমার ছোটোবেলা থেকে খাটছি।' তৈমুর লেপের একটা অংশ সযত্নে স্ত্রীর গায়ের ওপর তুলে দিল, 'আমি আমার সাধ্যমত তার জানা অজানা সবকিছু রক্ষার চেষ্টা করবো, কিন্তু এটা তোমার জানা উচিত আমাদের আপনজনই বলবে তৈমুর রাজার ভান্ডার লুটে খাচ্ছে।'

'বলুক। তা বলে আমার নাবালক ভাইবোনদের তো আমি দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে নিজের সুখ সাচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারি না।' জাহানারা স্বামীর দিকে পাশ ফিরল, 'কেউ এর মধ্যেই কিছু বলেছে?'

'এখনও বলেনি। তবে বলার আলামত টের পাচ্ছি।'

'কিভাবে?'

'আমজাদ মিয়া চৌধুরী মশায়কে বলেছে বুবুর জামাই এত বড় ব্যবসা-বাণিজ্য সামাল দিতে পারবে না। আপনাদের উচিত ছিল বাজারের দোকানপাট গুটিয়ে পাটের কারবারটার ভারই তাকে দেয়া। আর জমিজমা শরিকদের মধ্যে আজ হোক কাল হোক ভাগ বাটোয়ারা করতেই হবে। ফসলী সম্পত্তি ভাগ না করা নাকি সুবিচারের কাজ হয়নি। যার যার পাওনা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াই নাকি ভালো ছিল। আনুর নাকি খুবই টাকার দরকার ছিল অথচ ঘরবাড়ি, মাঠ, গরুবাছুর কিছুই এখন ভাগ না হলে আনু কোন সান্ত্বনায় বাড়ি ফিরবে?'

'আনু কখনো একথা বলেনি। আজ বিকেলেও আনু বলেছে জমিজমা বন্টন না হওয়াতে সে খুশী। সে তোমার ওপর ভরসা করে। বলল তৈমুর ভাইয়ের হাতে তার পাওনা ছেড়ে যেতে তার একটুও আপত্তি নেই। সে খুশী মনেই ময়মনসিংহ ফিরে যাচ্ছে।'

জাহানারা স্বামীর মাথার চুল বিলি করতে করতে বোনের সাফাই গাইল।

তৈমুর অন্ধকারেই একটু হাসল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে ডালপালায় আচ্ছন্ন টুকরো চাঁদের আলো এসে পড়েছে জাহানারার বুকের ওপর। কিন্তু মুখের ওপর প্রাচীন কুলগাছটার ছায়া এসে পড়ায় মুখটা অন্ধকার।

'বিপদ তোমার বোন বা ভগ্নিপতিরা হবে না। বিপদ বাঁধাবে তোমার মায়েরা। তোমার ভগ্নিপতি একটু লোভী হলেও তোমার অন্য ভাইবোনদের একেবারে ভাসিয়ে দিতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু দলিলের ওপর টেরচা সই দিতে পারে কেবল তোমার সৎ মায়েরা।'

'তাই যদি ভাবো তাহলে সব ধরে রাখার বৃথা চেষ্টা নিয়ে তুমি দোষী সাজতে গেলে কেন?'

'আমি তো নিজের থেকে এ দায়িত্ব নিইনি। সকলে চাপিয়ে দিয়েছে। আমি জানি, এর পরিণাম তোমার-আমার জন্য ভালো হবে না। অংশীদাররা আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট থাকবে। সবাই ভাববে আমি লুটপাট করছি। কিন্তু আমি এ অবস্থায় কি করতে পারতাম?' জাহানারার দিকে ফিরল তৈমুর, 'শেষ পর্যন্ত তোমার আব্বার এই রাজ্যপাট কারো পক্ষেই ধরে রাখা সম্ভব নয়। আমি শুধু এই ভেবেই নিয়েছি যদি খস্তে খস্তেও কয়েক বছর কেটে যায়, তবে হয়ত তোমার নিজের ভাইয়েরা অন্তত সাবালক হয়ে উঠবে। যদিও এরাই তোমাকে একদিন সব কিছুর জন্য চোর বলে সাব্যস্ত করবে। কারণ তুমি এদের সহোদর বোন আর আমার ওপর দশজন হাল ধরার কঠিন দায়িত্বটা চাপিয়ে গেলেন।'

'আমার ভাইয়েরা তোমকে চোর বলবে কেন?'

'প্রকাশ্যে হয়ত বলবে না, আড়ালে আবডালে বলবে।'

'আমর ভাইয়েরা যথার্থ মানুষ হলে একথা কোনোদিন বলবে না। আমাকে আব্বা বাড়িতে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন জানো না? কেবল এদিনের জন্যই। আব্বা আগেই আন্দাজ করেছিলেন তার হঠাৎ মৃত্যু হবে। কেউ কিছু বলবে এজন্য তো আর তুমি এদের গাঙে ভাসিয়ে দিতে পারো না।'

জাহানারা আবেগ-জড়িত গলায় বলল, 'আর এসব ছেড়েছুঁড়ে তুমি যাবেই বা কোথায়? তুমি নিজের জন্য তো এখনো কিছুই করোনি।'

'এখানেই আমার শ্বশুরের একটু চালাকী ছিল। তিনি আমাকে আমার নিজের পায়ে দাঁড়াবার কোনো সুযোগ দেননি। আমি একটা আলাদা দোকান করার কথা একবার সাহস করে তাকে বলেছিলাম। কথাটা শুনে তিনি যেন কেমন চমকে উঠেছিলেন। আমার এখনও মনে আছে। অনেকদিন আগের কথা অবশ্য, তোমার সাথে বিয়ের কিছুদিন পরই আমি জামসেদপুর টাটা কোম্পানীতে একটা চাকুরী জোগাড় করেছিলাম। আমার কলকাতার এক মাড়োয়ারী বন্ধু কারবারে আমার সততা দেখে আর আমার পারিবারিক পরিস্থিতি জেনে দয়াপরবশ হয়ে আমাকে চাকুরীটা পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি তার কাছ থেকে থান কাপড় কিনতাম। প্রায়ই হাজার পাঁচেক টাকা বাকি পড়ত। বেশী লাভের আশায় আমি তোমাদের দোকানের জন্য ঐ বাড়তি মালটা আনতাম, কিন্তু নিজে এর কোনো লাভ বা ফায়দা নিতাম না। আমার শ্বশুর যেদিন জানলেন সেদিন তাকে খুব খুশী দেখেছিলাম। তার মেজাজ খোশ্ দেখে আমি আমার নিজের জন্য একটা আলাদা দোকানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তিনি চমকে গেলেন। যেন তার ওপর বাজ পড়েছে।'

'আব্বা কি বললেন?'

জাহনারা এ অবস্থায় তার ভয়কাতর ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে পারল না।

তৈমুর একটু অনুচ্চ শব্দে হাসার ভঙ্গী করল, 'বললেন তোমার আলাদা দোকান করতে হবে না। জানুকে আমি নিজেই একটা দোকান, ঐ জগৎবাজারের কাটা কাপড়ের দোকানটা লিখে দেব। আর উপযুক্ত পূঁজি দেব যাতে তুমি নেড়েচেড়ে খেতে পারো। তবে এখন তোমাকে কায়কারবারে পাক্কা হয়ে উঠতে হবে। আমি যখন বুঝব যে তুমি পারবে, তখন সব ব্যবস্থা হবে।' তৈমুর আবার হাসল, 'আমার শ্বশুর আমার আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ইচ্ছেটা আন্দাজ করে ভয় পেয়েছিলেন।'

'আব্বার হয়ত তোমার জন্য অন্য কোনো ইচ্ছে ছিল। হয়ত হায়াতের অভাবে তা করে যেতে পারলেন না। তুমি তো জানো তোমাকে আব্বা কতটা

ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন।'

'সবি করতেন, তবে তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। আর ব্যবসায়ে নিজের লাভের স্বার্থ ছাড়া কিছু থাকে না জানু। তোমার আব্বারও ছিল না।'

'অকৃতজ্ঞ হয়ো না মাহমুদের আব্বা।'

জাহানারা স্বামীর মুখের কাছ থেকে নিজের বদনটা সরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে গেলে তৈমুর বলল, 'রাগ করছ কেন? আমি তোমাকে দুঃখ দেয়ার জন্য আমার চাচার গীবত গাইছি না। আমি কি জানিনা তিনি আমাকে কতটা আপন ভাবতেন আর বিশ্বাস করতেন? তবুও তিনি যে পাক্কা ব্যবসায়ী ছিলেন এটা আমার চেয়ে কে বেশী জানে? ব্যবসা বিষয়ে তার কোনো আপনপর বোধ ছিল না। টাকা খাটিয়ে কতটা লাভ লোকসান হবে তা তিনি আগেই খতিয়ে দেখতেন। এখানে কে মেয়ের জামায় আর কে ভাতিজা তা তার বিবেচনা পেত না। দেখলে না আমজাদ মিয়ার বাড়তি নেয়ার বিষয়টা তিনি কেমন নিজের হাতে হিসেব রেখেছেন। ঐ হিসেবটা দশজন জানলে তোমার বোনের পাওনা কিন্তু বিশেষ কিছু থাকবে না।'

'ও কথা তুমি বলো না।'

জাহানারা লেপের ভেতর স্বামীর হাত চেপে ধরল।

'আমি ওসব তোমার খাতিরে না হয় তুললাম না। কিন্তু তোমার বড় মা আর ছোটো জননী যদি বিষয়টা আন্দাজ করে থাকেন তবে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হবে। তারা কেউ আমার ওপর ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভার দিয়ে যাওয়াটা পছন্দ করেননি। তোমার ছোটো মা শুনেছি ডাক্তার কাকাকে নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে আপত্তি করেছেন।'

'তার আপত্তিটা কি?'

'তার কথা হল, জানুর জামাই দোকানপাট আর পাটের আড়ত দেখুক, কিন্তু ধানী জমির ছয় আনা অংশ তিনি পাবেন। জমিটা কেন এজমালি রাখা হল? তিনি চান জমি-জিরাত ভাগ হয়ে যাক। এবাড়ির দালান কোঠা, গোলা-গোয়াল-গরু আলাদা করে দেয়া হোক। তিনি তাঁর নাবালকদের নিয়ে ভিন্ন পাকঘরে রাঁধবেন। এতে আবার তোমার বোন জামাই আমজাদ মিয়াও নাকি শামিল আছে। সেও চায় জমি-জিরাত বন্টন হোক। এ অবস্থায় কতদিন শরিকদের তুমি ঠেকিয়ে রাখবে? মাঝখান থেকে সমস্ত দুর্নাম আমার ঘাড়ে চাপবে। আমার তো দেখছি একূল ওকূল দু'কূলই যাবে।

তৈমুর গা থেকে লেপটা সরিয়ে বলল, 'পাছিনা ছুটেছে।'

'লেপ সরালে তো আবার একটু পরেই শীত লাগবে।'

আবহাওয়াটা সবদিক দিয়েই আমার অসহ্য লাগছে জানু।'

'কূলের কথা কি জানি বললে?'

'বলছিলাম তোমাদের সয়সম্পত্তি রাখতে গিয়ে নিজের বোধ হয় কিছুই থাকবে না। সকলের সন্দেহ- শোবা নিয়ে যখন এ বাড়ি থেকে বেরুবো তখন জেনো নিজের কিছুই থাকবে না। না দোকান, না পুঁজি। এ জন্য বলছিলাম তোমার বাপ পাক্কা ব্যবসায়ী ছিলেন। ঘরেও তিনি হিসেব ঠিক রেখেছেন। গত এক যুগ ধরে তোমাদের দোকানে গোমস্তাগিরি করছি তিরিশ টাকা মাইনেয়। এর আর কোনো বেশ কম হলো না। এখন রাজ্যের দায়িত্ব আমার ওপর অথচ মাইনে বাড়াবার লোক কবরে গিয়ে শান্তিত্বে ঘুমিয়েছে।'

'তুমি নিজেই আরও কুড়ি টাকা মাইনা বাড়িয়ে নাওনা। তুমি যখন সবি দেখাশোনা করছ তখন নিজের বুঝটা বুঝরে না কেন? এতে কে আর কি বলবে? স্বামীকে আদর-সোহাগে যতটা পারে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গীতে দুবাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল জাহানারা, 'আমি না হয় আম্মাকে বলব তোমাদের জামাই এখন তো শুধু দোকান নয় আমাদের সবকিছু দেখছে তার তো আর তিরিশ টাকা বেতনে পোষায় না। আমি তাকে আর কুড়ি টাকা বেশী নিতে বলেছি। আশা করি বড় আম্মা এতে অমত করবে না। আমি ছোটজনকেও বলতে পারি, যদি তুমি বলো।'

'আমাকে হাসির পাত্র করো না।' স্ত্রীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল তৈমুর, 'এখন দশজনরে অনুমতি ছাড়া আমি আর তা পারি না। এক হয় যদি যে তিনজন মুরুব্বী আমার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন তারা বিষয়টা বিবেচনা করেন।'

'আমি তাহলে ফাদার চাচাকে বলি। তিনি তোমাকে খুব পছন্দ করেন। আমি তাকে বললে তিনি অন্যদের সাথে পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা করবেন। তোমার দাবি তো ন্যায্য।'

জাহানারা গভীর নির্ভরতায় স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে থাকল। তৈমর বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি মাহমুদের মা, কথাটা হল আমি যখন তোমাদের পরিবারের অভিভাবকত্ব নিয়েছি তখন তোমার আর এ বাড়িতে বসবাস করা ঠিক হচ্ছে না। এতে অবশ্য তোমার নিজের ভাইদের একটু অসুবিধা হবে। তবে তারা তো এখন আর শিশু নেই, নিজের ভালোমন্দ বোঝার বয়েস সকলেরই হয়েছে। তুমি না থাকলে অবশ্য তাদের পড়াশোনার তেমন তাগাদা থাকবে না। তোমার থাকাতেও যে খুব একটা আছে তা তো দেখি না। একজন সারাদিন গান-বাজনা-সিনেমা আর হুইলের ছিপ-বড়শী নিয়ে সারা এলাকার দীঘি, পুকুর আর নদীতে

ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যজন-ফুটবল নিয়ে মাতোয়ারা। কেউ ঠিকমত ইস্কুলে যায় বলে মনে হয় না। মাসে মাসে ইস্কুলের বেতন আর গৃহশিক্ষকের বেতন দিচ্ছি। এ অবস্থায় তুমি আমাদের নিজেদের বাড়ি ফিরে গেলে তারা যে কেউ পানিতে পড়ে যাবে এমন মনে হয় না। বরং তুমি এ বাড়িতে না থাকলে আমরা লুটেপুটে খাচ্ছি বলে যে রটনা আড়ালে আবডালে চলছে তা খানিকটা কমবে। আর আমার ভিটে বাড়িটাও আবাদ থাকবে, উঠোনে ঘাস গজিয়ে যাবে না। তুমি কি বলো?'

'আমি কি বলবো? তুমি ভালো মনে করলে কালই নিজের বাড়ি চলে যাব। তুমি ভাবো বাপের বাড়ি পড়ে থাকতে আমার সুখ লাগে?'

নিজের খোঁপাভাঙা বিপুল কেশরাশি স্বামীর মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে জবাব দিল জাহানারা।

'তাহলে বাড়িই চলে যাই চলো।'

'কালই চলে যাব।'

'কালই যেতে আমি বলছি না, যখন তোমার বোন ও ভগ্নিপতি এখানে আছেন। আর তাছাড়া চল্লিশার পর জেয়াফতের ব্যবস্থা সামাল না দিয়ে তোমার চলে যাওয়াটা কেউ ভালো চোখে দেখবে না। জেয়াফতে আমাদের পুরো গ্রামটাকেই দাওয়াত দিতে হবে। এ ব্যাপারে কার্পণ্য করলে তোমার নিন্দে হবে। বলবে বাপের শেষ কাজটাও গাঁয়ের মেয়েটা আর জামাই ভালো করে করল না। অথচ ডাক্তার কাকা আমাকে বলেছেন, জেয়াফত- নেমন্তন্নে তেমন আড়ম্বর না করতে।'

'তা বলে চার-পাঁচটা ষাঁড়ও জবাই দেবে না।'

'শুধু ষাঁড়ের গোস্তেই তো জেয়াফত হবে না, মণ মণ চাল, মশলা, লাকড়ি আর ঢাকা থেকে বাবুর্চি আনাতে হবে। অনেক টাকার ধাক্কা। এদিকে মওসুম যাচ্ছে, আরও কিছু পাট কেনা দরকার। চাহিদা অনুযায়ী এবার আরও হাজার মণ পাট কিনতে না পারলে নারায়ণগঞ্জের সায়েবরা অন্য আড়তদারের কাছে ছুটবে। সিন্দুকের টাকা দেখে তা তোমাদের ধারণা আমার হাতে অনেক টাকা। তোমার বাপের নতুন আড়তদারী ব্যবসার জন্য এ টাকা কিছুই না জানবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তৈমুর। যেন শ্বশুরের লেনদেনের বিপুলত্ব দেখে এখন সে ভীত। এত টাকা সে কোথায় পাবে?

'চৌধুরী কাকা যে বললেন তার কাছে কিছু পাওনা আছে। বিপদের সময় তার কাছে পাওনাটা চাইতে পার না?'

জাহানারাও প্রকৃতপক্ষে তার বাপের কায়কারবার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখে

না। সে ছেলেমানুষের মত পথ বাতলাতে একটু চেষ্টা করল মাত্র।

তৈমুর হাসল, 'এ সামান্য টাকায় কি হবে? তিনি অবশ্য টাকাটা তার দহলজে গিয়ে আনতে বলেছেন। ওতে কিছু হবে না।'

'তাহলে আমার মায়ের গয়না বাটোয়ারা করতে চাইছো কেন? ওখানে তো শত ভরি সোনার জড়োয়া আছে। ওগুলো রেখে টাকা পাওয়া যায় না?

'তা অবশ্য যায়। কিন্তু তোমার ভগ্নিপতি যে ওসবের ওপর ওৎ পেতে আছে।'

'থাকুক। আমার মায়ের জেয়র এই মুহূর্তে ব্যবসার কাজে লাগলে ওসব এখন ভাগের দরকার নেই। আমি আমার বোনকে বুঝিয়ে বললে সে মানবে।'

তোমার বোন মানবে, কিন্তু ভগ্নিপতি তোমার বোনের সাথে মহা অশান্তি সৃষ্টি করবে। আর ব্যবসাটা যেহেতু তোমাদের একার নয়, সকলেই এর লাভালাভের হিস্যা পাবে, সে কারণে আমি কি করে কেবল আমার শ্বাশুড়ীর অলংকার বন্ধক রাখার প্রস্তাব দিই? আমজাদ মিয়া কথা তুলবে না। এমন যদি হত তোমার সৎ মায়ের জেওরও ওর সাথে বন্ধক দিয়ে টাকা আনার কথা হত তাহলে এতে আপত্তির কিছু হত না। ব্যবসায়ের লাভালাভ সকলের কিন্তু পুঁজির একটা বড় অংশ যদি তোমার মায়ের গয়নার বন্ধকী পুঁজি থেকে আসে তাহলে ছোটো জামাইয়ের আপত্তি হবে না কেন? আমারও এতে আপত্তি আছে।'

স্ত্রীর দিক থেকে পাশ ফিরল তৈমুর। তার দুচোখের পাতা বুঁজে আসছে।

'আমি তাহলে আমার সৎ মায়েদের বলি। তাদের কাছে যদি নগদ কিছু পুঁজি থাকে তাহলে পাট কেনার জন্য তোমাকে দিক। তাদের তো সোনাদানা বাক্সে পড়ে আছে। এখন ব্যবসায় খাটালে এতে যদি লাভ পায় তবে তোমাকে দেবে না কেন?'

তৈমুর কোনো জবাব দিল না। জাহানারা বুঝল, স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে। সে লেপ সরিয়ে নিজেও পাশ ফিরল। তারও পাছিনায় বুক ভিজে গেছে।

৬

মৌড়াইল মহল্লার সবচেয়ে প্রাচীন ভিটে-বাড়ির ওপর সবচেয়ে উঁচু আটচালা ঢেউটিনের ঘরটাই তৈমুরদের। প্রায় একবিঘা জমির ওপর বিশাল উঠোনসহ বাড়িটার চৌহদ্দিতে নানারকম গাছ। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, বেল আর একটা বিশাল নিম। ছোটো একটা লেবু গাছও আছে। আর আছে নানা লতানো

গাছ। যেমন পেস্তা আলুর লতায় ছেয়ে আছে একটা ডেওয়া গাছের শীর্ষ থেকে শিকড় পর্যন্ত। উঠোনে গোটা কয়েক আভা বাইগনের গাছ যত্ন করে লাগানো আছে। চারপাশে তারের বেড়া। দুটি বাইগনের পাতাকে জোড়া দিয়ে টুনটুনির বাসা ঝুলছে। দোয়েলের বাসার সুবিধের জন্য কে যেন একটা ফুটো কলসী কাত করে বসিয়ে দিয়েছে বেলগাছের এক শক্ত শাখা-সন্ধিতে।

এখন ভোরবেলা। গাছে পাখিদের জন্য পেতে দেওয়া কলসীর পেটে একটা স্ত্রী দোয়েল লেজ উঁচিয়ে এদিক সেদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কিন্তু শীতের সকালে কুয়াশার পর্দা গাঢ় হওয়ায় পাখিটা উড়াল দেয়ার মেজাজ পাচ্ছে না। দোয়েলটা একবার একটা শিস দিয়েই পালক খেলালে মেতে গেল। সম্ভবত পাখিটার পালক শিশিরে ভিজে ভার হয়ে থাকায় সে সকালের রোদের অপেক্ষায় ডানা দু'টিতে চঞ্চু বুলিয়ে মাঘের শীতের প্রচন্ডতা অনুভব করতে চাইছে। কিন্তু কুয়াশা ঢাকা বাড়ির নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করতেই যেন হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে বাইগন পাতার বাসা থেকে টুনটুনিটা। এক খন্ড পেঁজা তুলোর মত উড়তে উড়তে সে পেস্তা আলুর লম্বা লতার ওপর আড় হয়ে বসে টুই টুই করে ডেকে যেতে লাগল। টুনটুনিটা যেন পাখি নয়, প্রকৃতির এক বিন্দু উড়ন্ত প্রাণস্পন্দনের মত ভোরের ঘুমন্ত বাড়িটাকে মাতিয়ে তোলার ক্ষুদে সংগীত যন্ত্র।

টুনটুনির ডাকে ঘরের ভেতর মাহমুদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে গা থেকে লেপ সরিয়ে উঠে বসল। ঘরের টিনের বেড়ার ওপর অংশে বাঁশ-বেতের সূক্ষ্ম কারুকাজ। মাঝে-মধ্যে গোল লাল-নীল আয়না লাগানো। এক সময় বেতের কাজের ওপর হয়ত লাল-নীল রং মিনে করা ছিল, এখন রং চটে গিয়ে এক ধরনের প্রাচীনতার আভাস মাত্র লেগে আছে। এরই ফাঁকফোকর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতরের কারুকার্যময় প্রাচীন আসবাবপত্রে। সেগুন কাঠের একটা ছোটো খাট পাতা আছে অন্য একটা প্রধান পালংকের পাশে। এটাই মাহমুদের শয্যা। প্রধান পালংকে থাকেন তার আব্বা-আম্মা। জাহানারা ও তৈমুর। আড়াই তিন হাত দূরেই মাহমুদ শোয়। পাশে একটা কিতাব রাখার সেগুন কাঠের তাক। তাকের ওপর পিতলের চেরাগদান ও আগর-লোবান জ্বালাবার শতছিদ্রযুক্ত চীনে মাটির গলুই উচা নৌকা। মাহমুদের মাথার ওপরও একটা বিশাল তাক। সে তাকেও চামড়ার বড় বড় মলাট ঢাকা কিতাব। সবি আরবী-ফার্সী কাব্যগ্রন্থ। সাদী, রুমী, হাফিজ ও ফেরদৌসীর কাব্যগ্রন্থই বেশী। তবে অন্ধকার যুগ ও ইসলামী যুগের আরব কবিরাও আছেন। সাবা মোয়াল্লাকা, ইমরাউল কায়েস থেকে লবিদ পর্যন্ত। এক শতাব্দী আগে এ বাড়ির প্রাচীনেরা এসব পড়তেন। মাহমুদের দাদা ছিলেন এসব বইয়ের সর্বশেষ রসগ্রাহী পাঠক। তারপর এ বাড়ির

অন্য কেউ এসব বই নেড়েচেড়ে দেখেননি। আর এখন তো এসব বইয়ের ভাষা বোঝার মত মানুষই এ বাড়িতে কেউ নেই।

ক্ষুদে পাখিটার টুই টুই ডাকের তীক্ষ্ণতা ক্রমাগত বাড়ছে। মাহ্মুদ বিছানায় বসে পাখিটার ডাক কতক্ষণ শুনে জানালার একটা পাট খুলতেই পাখিটা বেগুন পাতার বাসার ওপর এসে টেরচা হয়ে বসল। মাহ্মুদ পাখিটাকে দেখেই বুঝল পাখিটা ডিম পাড়বে। কিন্তু শিশিরে সবকিছু সিক্ত থাকায় পাখিটা সুবিধে করতে পারছে না। এর ওপর পাখিটাকে দেখে মাহ্মুদের কেন জানি মনে হল টুনটুনিটা ক্ষুধার্ত। সকালবেলা ডিম ছাড়ার ধকল পুশিয়ে সে আর পোকা-মাকড় ধরার শক্তি পাবে না বলেই সম্ভবত তার পুরুষ-সঙ্গীকে ডাকছে, যাতে কাছাকাছি থেকে স্ত্রী পাখিটাকে একটু সাহায্য করে। কিন্তু পুরুষটির কোনো পাত্তাই নেই। প্রাণী ও পাখ-পাখালীর জগতে পুরুষদের স্বভাব সম্ভবত একই রকম। একটু দায়িত্বজ্ঞানহীন বটে।

এ বাড়ির আঙ্গিনায় যত পাখি, প্রজাপতি, পতঙ্গ ওড়াওড়ি করে সবগুলোকে মাহ্মুদ চেনে। এ বাড়ির প্রতিটি গাছের প্রতি তার মায়া মুহব্বত। আর আছে গৃহপালিত একটা ছাগী। পাকঘরের পাশে একটা ছোটো কুঁড়ে আছে। মেঝেটা পাকা। ওঘরে কোহীনূর অর্থাৎ মাহ্মুদদের ছাগীটা থাকে। মোরগ-মুরগীর খোয়াড়ও একটা আছে। দশ-এগারোটা মুরগী আর কয়েকটা হাঁস পালে জাহানারা। লালন-পালনটা অবশ্য নিয়মিতভাবে জাহানারা করতে পারে না। করে মাহ্মুদ। জাহানারা তো বলতে গেলে সারা বছরই মাহ্মুদের নানা বাড়িতে থাকে। প্রয়োজনে আম্মাকে থাকতে হয় ওবাড়িতে। এতদিন ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে নানারও আব্বা-আম্মাকে কাছে রাখা দরকার ছিল। সম্বৎসর থাকতেনও তারা ওখানে। সারা বছরই মাহ্মুদ ও মাহ্মুদের আম্মাকে নানা বাড়ি থেকে সকাল-সন্ধ্যা এসে এ বাড়িটার দেখাশোনা করতে হয়েছে। মাহ্মুদ সকালে এসে খোয়াড় খুলে মোরগ-মুরগীকে খুদকুড়া খাইয়ে, হাঁসগুলোকে পুকুরে নামিয়ে দিয়ে ছাগীটাকে নিয়ে জর্জ স্কুলের মাঠে বা পুকুরের পাড়ে খুটা দিয়ে তবে ইস্কুলে যায়। সন্ধ্যায় আবার সব গুটিয়ে এনে রেখে যেতে হয় খোয়াড়ে যার যার জায়গায়। তখন চোরের উপদ্রব ছিল না। বাড়িটা খালিই পড়ে থাকত। মাহ্মুদকেও থাকতে হত আব্বা-আম্মার সাথে। যদিও ওবাড়িতে থাকতে একটুও ভালো লাগে না মাহ্মুদের। মাঠের মধ্যে মস্ত খামারবাড়ির মত নানার বিশাল বাড়িটায় ঘুরে ফিরে তেমন সুখ পায় না মাহ্মুদ। কারণ এখানে প্রকৃতির মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই। বিশাল ছ'কোঠাঅলা বাড়ির সামনে কেবল মাঠের মত উঠোন। তার পাশে দীঘির মত বিশাল এক পুকুর। পুকুর পাড়ে কাঁঠাল আর ফুল গাছের সারি। আর

বিশাল বিশাল গোয়াল। শতাধিক গাই গরু। বাড়িটার বাতাসের মধ্যেই যেন কেমন খামারের গন্ধ। চারদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে আসছে শস্যের বাতাস। ধান, পাট, গরু, মাছ ও দুধের গন্ধ ছাড়া মাহমুদ নানা বাড়িতে কোনো গন্ধ খুঁজে পায় না। ও বাড়িতে মানুষ কেবল টাকা আর বৃহস্পতিবারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশাল হাটের কথা চিন্তা করে। শুকানো পাট আর রোদে পিরামিডের মত ছড়িয়ে রাখা ভেজা শোলার গন্ধ ছাড়া আর কোনো গন্ধ পায় না মাহমুদ তার মামুদের বাড়িতে। ও বাড়িতে সারাদিন কাটাতে ভালো লাগে না মাহমুদের। যদিও তার মামুরা দু'একজন ছাড়া সকলেই তার সমবয়স্কই বলা যায়। যারা রয়েছে বড় তারা সকলেই তার আপন মামু। সৎ মামুদের দু'জনই তার একই বয়েসের হলেও তারা তার সাথে মেলামেশা করতে আগ্রহী হয় না। মাহমুদও পারতপক্ষে মামুদের এড়িয়ে চলতেই ভালোবাসে। এটা কোনো হিংসে থেকে সৃষ্টি হয়নি। হয়েছে এক ধরনের সম্ভ্রমবোধ থেকে। মামুরা মনে করে তারা এক বয়েসী হলেও একটু তালেবর। কারণ তারা মাহমুদের ওপরের ক্লাসে পড়ে। তাও আবার জর্জ হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে। আর মাহমুদ পড়ে গাঁয়ের অবৈতনিক মিশনারি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে। ফাদার জোন্‌সের পরিচালিত স্কুলে। যেখানে একদা এ বাড়ির পর্দানশীন মেয়েরা, মাহমুদের আম্মা একটা পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে এসেছে।

মামু-বাড়ির পরিবেশটা মাহমুদের মনঃপুত নয়। যদিও তার আম্মা ও বাড়িতে বেশ মানিয়ে যান। তার খবরদারিতেই এখনও সব চলে। যেমন তার নানা জীবিত থাকতেও তার মাই ছিল মূলত মোল্লা সাহেবের নয়া বাড়ির কর্ত্রী।

মাহমুদের ভালো লাগে ও বাড়ির খাদ্য। ভোজ। মাছের মুড়ো, ঘন দুধ, দুধের সর, রাজ্যের মাছ মাংস ও তরকারীতে বাড়িটার ভেতর দিককার বারান্দার দস্তরখান যেন উপচে পড়ে। নানা জীবিত থাকতে মাহমুদের আম্মা মাহমুদকে হররোজ নানার সাথে খেতে বসাতো। সেখানে অবশ্য মাহমুদের সমবয়স্ক অন্যান্য মামুদের টেনেও আনা যেত না। কারণ তারা ভয়ে বাপের কাছে ভিড়তো না। না ভেড়ার কারণও অবশ্য মারাত্মক রকম প্রত্যহই একটা না একটা উপস্থিত থাকতো। কারো বাড়ির ফল চুরি, স্কুল কামাই, গাঁয়ের সম্মানিত মুরুব্বীকে জিন সেজে ভয় দেখানো। কিংবা দালানের ছাদে উঠে লাফালাফি করে সকলের ঘুমের আরামের বারোটা বাজানো ইত্যাদি। তারা তাদের আব্বার সাথে পাতপেড়ে খাওয়া থেকে এক রকম বঞ্চিতই থাকতো। তবুও কখনো কখনো মাহমুদের আম্মা হাতের কাছে তাদের কাউকে পেলে জোর করে বাপের পাশে সাহস করে বসিয়ে দিত। এতে অবশ্য আরও খারাপই হত। এতে ঐ মামুটা ভয়ে লোকমা

তুলতেই পারত না। শুধু বড় বোন অর্থাৎ জাহানারার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে নানার খাওয়া সেরে ওঠা পর্যন্ত সে বসে থাকতো। এই অস্বস্তির মধ্যে কে কাকে ডেকে আনে? পরে আম্মাও নানার দস্তরখানে তাদের ডেকে আনতো না। ওসব রুচিকর খাদ্যের স্বাদ নানার পাতের পাশে বসে মাহমুদই একাকী ভোগ করত। মাঝে-মধ্যে মাছের আস্ত মুড়োটা নানা নিজেই তুলে দিতেন মাহমুদের পাতে।

নানাকে খুব ভালোবাসলেও খাওয়ার সময় ছাড়া তার কাছাকাছি হওয়া সম্ভব ছিল না মাহমুদের। নানা ছিলেন ভাবগম্ভীর মানুষ, তার ওপর আফিমখোর। চোখ দু'টি সব সময় ভাটার মত জ্বলতো। দেখলেই কেন জানি মনে হত কাউকে মেরে ফেলার ফন্দি আঁটছেন। কিংবা এ দুনিয়ায় যা কিছু ভালো জিনিস আছে নানা বুঝি এক্ষুণি কিনে ফেলতে চান। নানাকে মাহমুদের ভালো লাগার একটা বড় কারণ নানা তার আম্মাকে যতটা ভালবাসতেন ততটা ভালো বোধহয় তিনি কাউকেই জীবনে বাসেননি। তার অন্য ছেলে-মেয়েরাও তাকে ভয়ে এড়িয়ে চলত। তাদের মুখের দিকেও পারতপক্ষে তিনি তাকিয়ে দেখতেন না। কেবল মাহমুদের আম্মা এলেই তিনি বাড়িতে 'আমার মা' এসেছে বলে খুশী হয়ে ইসমাইলকে ছিলুম লাগিয়ে দিতে বলে ফার্সী হুঁকোয় ক্রমাগত টান মেরে যেতেন। আর কদমবুসীরত মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতেন, 'এসেছিস যখন, মাস দু'য়েক থেকে যা মা। আমার কত কি খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু কাকে বলি? তোর মা মরে যাওয়ার পর আমি আর কাউকে রাঁধতে বলিনি মা?'

মেয়ে চমকে উঠে বাপের হাত ধরে ফিস ফিস করে বলেছে, 'আস্তে বলুন আব্বা। আমার অন্য মায়েরা শুনতে পেলে মনে আঘাত পাবে। তাছাড়া আপনি আমার এই মায়েদের রাঁধতে বললেই পারেন? তারা তো কেউ আর ফ্যালনা নন! দু'জনই এ অঞ্চলে সেরা রাঁধুনী। এসেছেনও বড় বড় ঘর থেকে। আর আপনি আমার হতভাগিনী মায়ের ওপর অভিমান করে পছন্দের ব্যাঞ্জন না খেয়ে অভিমান করে শুয়ে থাকেন?'

'তুই কয়েক মাস থেকে রেঁধে আমাকে খাইয়ে যা মা। কখন মরে যাই কে জানে?'

কথা বলার সময় নানাকে তখন খুব অসহায় দরিদ্র মনে হত মাহমুদের। মনে হত, নানা লক্ষ লক্ষ টাকার ওপর ঘুমিয়েও কত কাঙাল! এভাবে মাসের পর মাস জাহানারাকে বাপের বাড়ি পড়ে থাকতে হয়েছে। লোকে তখনও বদনাম গেয়েছে, এখনও গায় যে, মোল্লা সাহেবের গাঁয়ের মেয়েটা লুটেপুটে খাচ্ছে। অথচ নিজের বাড়িতে আম্মা মাহমুদদের ছোটো দরিদ্র সংসারেই সবচেয়ে বেশী

সুখী। শাক শুঁটকিতেই মাহমুদের আব্বা-আম্মা বেশী পরিতৃপ্তির সাথে জীবন কাটাতে পছন্দ করে এসেছে। পারেনি কেবল বাপের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে। এখন নানা মরে গেলেও আব্বা-আম্মার মুক্তি নেই। কেন নেই, এই ক্ষোভ ছোটো হলেও মাহমুদের মধ্যে কাজ করে। কারণ সে জানে, গাঁয়ের লোকেরা মনে করে তার আম্মা নানা বাড়ি থেকে ধন-সম্পদ হাতাচ্ছে। মাহমুদের মামুদের অবুঝ পেয়ে তার আব্বাও নিজের আখের গোছাচ্ছে। এসব ফিসফাস মাহমুদেরও কানে যায়। তার সোজা সরল বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে এসব দুর্নামে তার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও সে চুপ করেই থাকে। তবে গতকালই প্রথম সে তার মাকে বলেছে, 'আমি রাতে আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকব।'

মা একাকী ভয় পাওয়ার প্রসঙ্গ তুললেও মাহমুদ পাত্তা দেয়নি। আমি ভয় পাই না। নিজের খাটে নিজের বালিশে যেখানে রোজ শুই, সেখানে ভয় পাবো কেন? মাহমুদ অবশ্য এমনিতেই একটু নির্ভীক। এই নির্ভীকতা বেড়েছে দেশীয় খৃস্টান ও নিউজিল্যান্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের দু'য়েকটি সাদা ছেলেমেয়ের সাথে লেখাপড়া করে। তাছাড়া আছে মাহমুদের বই পড়ার বাতিক। যারা বই পড়ে তারা আল্লাহকে ছাড়া আর কোনো কিছুতেই ভয় পায় না। মাহমুদ দেখেছে খৃস্টান পাড়ার প্রায় সকল ছেলেমেয়েই কেউ খেলাধূলা. কেউ সেলাই, কেউ বাগান নিয়ে মেতে থাকে। কেবল মুসলমান ছেলেমেয়েরাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কিছু করে না। আলসেমী করে কাটায়। মাহমুদকে ফাদার জোনস্ ডেকে বলেছেন, 'শুনলাম তুমি ক্লাসের পড়াশোনা ছাড়াও কিছু করতে চাও? খুব খুশীর কথা, তোমার আম্মাও আমার ছাত্রী ছিলো। তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি, তুমি রাজ্যের যত রূপকথা-উপকথা আছে খুঁজে খুঁজে পড়বে। নানা জাতির নানা রূপকথা উপকথা আছে, খুব সুন্দর আর বিচিত্র। এই একটা কাজের মত কাজ তোমাকে দিলাম। সফল হলে জগতে তোমার অনেক নামধামও হতে পারে।

সেই থেকে মাহমুদের বই পড়া শুরু। বই পেতে অবশ্য তেমন ছুটোছুটি করতে হয় না। মিশনে যেমন ছোটোদের বইয়ের বিশাল ভান্ডার আছে, তেমনি তখনকার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার গড়ার চল ছিল বলে বইপত্রের কোনো অভাব ছিল না।

ফাদার জোনস্ যে মাহমুদকে এমনিতেই বই পড়ার কাজ দিয়েছে তা নয়। মাহমুদকে গীর্জার সামনের বারান্দায় ছুটির দিনে গল্পের বই হাতে বসে থাকতে ফাদার জোনস্ মাঝে মধ্যে দেখেছেন। ছেলেটির বই পড়ার আগ্রহ তার চোখে লাগায় তিনি মাহমুদের জন্য বাড়তি কাজের এই পরামর্শ দিয়েছেন। এরপর থেকে বই পড়া নিয়ে মাহমুদ স্বাধীন। যদিও আব্বা-আম্মার এখনও সন্দেহ যায়নি।

৭

মাহমুদ ঘরের বাইরে এসে মুরগীর খোঁয়াড়টা খুলে দিয়ে খোয়াড়ের ওপর শিকেয় ঝুলিয়ে রাখা টোপা থেকে এক মুঠ খুদকুড়ো নিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে দিলে মোরগ-মুরগীরা কক্ কক্ শব্দে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক পা এগিয়ে গিয়ে মাহমুদ হাঁসগুলোকেও ছেড়ে দিল। হাঁসগুলোকে অবশ্য তোলা খাদ্য খাওয়াতে হয় না। ছাড়া পেলেই ওরা দল বেঁধে পুকুরের দিকে ছোটে। কাছেই এ বাড়ির প্রাচীন শরিকানা দীঘিতুল্য এক শান-বাঁধানো পুকুর। ঘাটটা কত কালের পুরানো কে জানে? পাতলা লাল ইটের তৈরী সিঁড়ি। নিচে অনেকদূর পর্যন্ত নেমে গেছে। আজও গোসলের সময় মেয়েদের গয়না কখনো কখনো অসাবধানে হারিয়ে গেলে হারানো অলংকার ডুব দিয়ে দিয়ে তুলে আনতে গিয়ে অনেকে অনেক জিনিস খুঁজে পায়। হারানো সোনাটা খুঁজতে গিয়ে হয়ত কারো হাতে উঠে আসে কয়েকশো বছর আগে হারানো পূর্বপুরুষের অন্য কারো শেওলাপড়া কানের দুল, মাকড়ী, বালা কিংবা সুলতানি আমালের কোনো কালো হয়ে যাওয়া সোনার টাকা। একটু ঘষতেই বেরিয়ে পড়ে আরবী কিংবা ফারসী হরফ। কষ্ট করে কেউ পাঠোদ্ধার করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখে, এটা তো সেই সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আশরফি, একদা যিনি সোনারগাঁয়ের তখতে বসে দিল্লীকে বুড়ো আঙুল দেখাতেন! আশ্চর্য, অতীতের এই পুকুর আর ঘাটলাটা এখনো আছে। যদিও ঘাটলাটা খোয়া উঠে অনেকখানি ভেঙেচুরে গেছে। তবুও তো এখনো এই প্রাচীন পুকুর ব্যবহার্য আছে। যদিও মাহমুদ জানে পুকুরের পানি গত এক যুগের মধ্যে কয়েকবার সেঁচে ফেলে দিতে হয়েছে। কারণ এর পানি সহজেই শেওলা পড়ে সবুজ হয়ে যায়, এক ধরনের সর পড়ে থাকে পানির ওপর। পুকুরটা যে এখনও ব্যবহার্য আছে এ ব্যাপারে মামুদের আব্বা বলেন, পারিবারিক পুকুর বলেই এটি সচল আছে। দীঘি হলে শুকিয়ে চর পড়ে যেত। তাছাড়া তার পূর্বপুরুষরা নিশ্চয়ই পুকুরটার বার বার সংস্কার ও পানি শুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তা না হলে ঐ সময়কার কোনো তালাব তো এখনো টিকে নেই। ভাদুগড়ের কাটা পুকুরটাও লোকে বলে অতি প্রাচীন। কিন্তু ওটা মানুষের নিত্যদিনের কাজকর্মে ব্যবহার্য না থাকায় কিংবা জনপদ থেকে একটু দূরে থাকায় এখন ওর ভেতরের দিক থেকে এক ফাটল এসে পাড় পর্যন্ত মাঝামাঝি দু'ভাগে

ভাগ করে ফেলেছে। হয়ত কোনো ভূমিকম্পের সময় ঘটনাটা ঘটেছে। লোকে এখন নাম দিয়েছে ফাটা পুকুর। কে জানে, কোন্ অতীতে কে পুকুরটা খুড়িয়েছিল? সে তুলনায় মোল্লাবাড়ির তালাবটা এখনও সচল। সিঁড়ি বেয়ে একটু নামলেই আর থৈ পাওয়া যায় না। মাঝখানটা নাকি পাতালের মত গভীর। শত বছরের প্রাচীন মাছ নাকি এখনো সেই অতলে ঘুরে বেড়ায়। জ্বিন, সিন্দুক আর ডেক-ডেকচি জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে বাড়ির প্রাচীনরা দেখেন বলে ভয় দেখানো হয়। মাহমুদ জানে, ওসব হলো বাড়ির বুড়ীদের গালগল্প মাত্র। সাঁতার না জানা এ বাড়ির শিশুরা যাতে ভাঙা ঘাটলার পিছল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে ডুবে না মরে সে জন্যই ঐসব ভয়ের গপ্পো বলে ঘাটলা থেকে দূরে রাখা হয়। মাহমুদ অবশ্য সাঁতার জানে এবং ঐসব আজগুবী কাহিনীতে ভড়কে যাবার বান্দা নয়। সে সুযোগ পেলেই সারা পুকুরে সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মধ্যে ছিপ ফেলে মাছ ধরারও চেষ্টা করে। ঘরে তার আব্বার যে হুইলে দুই বড়শিঅলা বিলিতি ছিপ আছে, সুযোগ পেলেই মাহমুদ ওতে বল্লার টোপ গেঁথে ঘাটলায় বসে থাকে। একবার সে এক রক্তবর্ণ বিরাট রুই মাছ ধরে বাড়ির সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। এক শ' বছরের প্রাচীন রুই-কাতলা না থাকলেও পুকুরে বড় মাছের কোনো অভাব নেই। প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর মাইমল পাড়ার জেলেরা এসে মোল্লাবাড়ির পুকুরে মাছ ছেড়ে যায়। জাল ফেলে তোলেও। তখন মোল্লাবাড়ির বাতাস মাছের গন্ধে ভরে যায়।

হাঁসগুলো ঘাটলার দিকে চলে গেলে মাহমুদ এসে ছাগীটার দড়ি খুললো। খুললেও দড়িটা ধরে রাখতে হয়। ছাগীটা খুব বদমাশ। একটু ছাড়া পেলেই সে দাওয়ার সুর্মা মরিচের ফলন্ত গাছ কিংবা বেগুন ক্ষেত তছনছ করে ফেলে। মাহমুদই ছাগীটার নাম রেখেছে কোহিনুর। কোহিনুরের বিশাল ওলান দু'টি লম্বা বানসহ দুধের ভারে মাটি ছুঁই ছুঁই হয়ে ঝোলে। সে সকাল-বিকেল দু'বেলা প্রায় দেড় সের দুধ দেয়। মাহমুদ নিজেই দুধ দুইয়ে নেয়। খায়ও নিজেই। এ দুধটুকু তার জন্যই বাপ-মা বরাদ্দ রেখেছেন।

কোহিনূরকে নিয়ে মোটা ও লম্বা দড়িসহ মাহমুদ জর্জ স্কুলের মাঠের দিকে চলল। ছাগীটাকে সেখানে ঘাসের মাঠে রেখে এসে মাহমুদ হাত-মুখ ধুয়ে ক্লাসের পড়া তৈরী করতে বসবে। বাড়ির বাইরে এসে দেখে এখনও রাস্তাঘাটের কুয়াশা সরেনি। যদিও বেশ বেলা হয়েছে এবং পূর্বের সীমা ছেড়ে সূর্য বেশ একটু ওপরে দাঁড়িয়ে তার কুয়াশাচ্ছন্ন মুখ দেখাচ্ছে। মাহমুদ দেখল তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে তার সমান বয়েসের হিন্দু মেয়েরা প্রাত্যহিক পূজো-আর্চার ফুল তুলে ফিরছে। তখন শহরের সবচেয়ে বড় ফুল বাগানগুলো ছিল মাহমুদদের

মহল্লায়। মৌড়াইল গাঁয়েই ছিল এসডিও সাহেবের বাড়ি, খৃষ্টান মিশন, নিয়াজ পার্ক, পুলিশ সাহেবের বাড়ি এবং সরকারী ডাকবাংলো। আর এর প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানেই ছিল সযত্নে তৈরী ফুলের বাগান। লাল রং-বেরংয়ের ফুলের সমারোহ। সারা শহরের দৈনন্দিন পূজার ফুল তুলতে ঝাঁক বেঁধে কম বয়েসী মেয়েরা খুব ভোরে আসতো এদিকে। মাহমুদদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে তারা দল বেঁধে যেত। এদের কেউ কেউ মাহমুদের সহপাঠিনী।

মাহমুদকে দেখে তারা একটু হেসে রাস্তাটা পার হয়ে গেলে মাহমুদ কোহিনুরকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে মাঠে এসে নামল। কুয়াশা সরে গিয়ে ততক্ষণে রোদ এসে পড়েছে মাঠে। নরম রোদ। মাহমুদ মাঠের পূবদিকে গিয়ে মাঠের অপর দিকে যেখানে মাদার গাছেরই একটা সারি এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে সেখানে একটা সবুজ ঘাসের উঁচু জায়গা দেখে কোহিনুরের লম্বা দড়ির খোটা পুঁতলো। সারাদিন ছাগীটা এখানে নিরাপদে ঘাস খেয়ে পেট ভরাতে পারবে। খোটা পুঁতে হাতের ইট ফেলতে গিয়ে মাহমুদ দেখল একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

'এটা তোমার ছাগল? তুমি ছাগল পোষো?'

মাহমুদ একটু লজ্জা পেল। মেয়েটি তার সহপাঠি। খৃষ্টান মিশনেরই মেয়ে। শ্বেতাঙ্গিনী। নাম মারিয়া কুকার। অরফেন। মিশনের দিদিমণিদের হোস্টেলে থাকে।

মাহমুদ একটু সংকুচিত হয়ে বলল, 'এটা ছাগল নয়, ছাগী। নাম কোহিনুর।' মাহমুদ ভাবল এখানকার সায়েবরা সব সময়ই বাংলা বলতে গিয়ে যেমন হামেশা গড়বড় করে ফেলে মারিয়াও বোধহয় ছাগলের স্ত্রী লিঙ্গ যে ছাগী এটা জানে না। এখন ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে সেও হাসার চেষ্টা করল, 'কোহিনুর খুব ভাল জাতের ব্ল্যাক গোট। আব্বা আসামের জয়ন্তিয়া পাহাড় থেকে কিনে আমাকে উপহার দিয়েছেন। দিনে দেড় সের দুধ দেয়। আমিই পালি, চরাই।'

'তুমি ছাগলের দুধ খাও?'

'কেন, খেলে কি হয়? মহাত্মা গান্ধীও তো খান।'

'ও' এ জন্যই তোমার গা থেকে ক্লাসে কেবল দুধের গন্ধ বেরোয়।'

খিল খিল করে হাসল মারিয়া, 'তোমাদের গান্ধীটাতো একটা নেকেড বেগার, গায়ে কাপড় পরতেও শেখেনি। ওফ, কি দুর্গন্ধ!'

মাহমুদ বুঝল শাদা চামড়ার দামড়ীটা তাকে গায়ে পড়ে অপমান করে চলেছে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সেও হেসেই অপমানের জবাব দিল, 'আমি তো তোমার বেঞ্চেই বসি না তোমার পচা গন্ধের ভয়ে। আমি বসি

কংকার সাথে ফার্স্ট বেঞ্চে। তুমি লাস্ট বেঞ্চে বসে কেবল আমার গায়ে দুধের গন্ধ পাও কি করে? আসলে ওটা তোমারই শাদা চামড়ার বাসি গন্ধ।'

'কি বললে, আমার গায়ে পচা গন্ধ?'

'শুধু তোমার গায়ে কেন, তোমাদের মিশনের সাহেব মেমদের গায়ে শুয়ের গন্ধ। তোমরা তোমাদের গায়ের দুর্গন্ধ পাবে কোত্থেকে, তোমরা যে উইকে একবারও গোসল করো না। কেবল সেন্ট মেখে গীর্জায় গিয়ে যীশুকে ডাকলেই গন্ধ চাপা থাকে ভেবেছো?'

'দাঁড়াও আমি তোমার নামে ফাদার জোনস্‌কে নালিশ করে দেব।'

বলেই মারিয়া চলে যেতে উদ্যত হলে মাহমুদ বলল, 'নালিশ দেবে দাও গিয়ে। আমিও ফাদারকে বলব, তুমি আমাদের গান্ধীকে লেংটা ভিখিরি বলে গাল দিয়েছো।'

'গাল দিয়েছি বেশ করেছি। ঐ ফকিরটা আবার তোমাদের নেতা হল কি করে? মহমেডানদের নেতা তো মিস্টার জিন্নাহ্‌। জিন্নার মেয়েতো আমাদের কম্যুনিটির ছেলেকে বাগিয়ে বিয়ে করেছে। কিছুই জানো না বুঝি? তুমি একটা ছাগল।'

বলেই মারিয়া হন হন করে মাঠের মাঝ বরাবর হাঁটা শুরু করল। মাহমুদ সত্যি অত কথার কিছু জানে না। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মেয়ে খৃষ্টানকে বিয়ে করেছে? এ কেমন কথা। খুব অবাক হল মাহমুদ। তবুও অই শাদা পেত্নীটার মুখের ওপর মনের মত জবাব দিতে পেরে মাহমুদ খুব খুশী। হোক গান্ধী হিন্দুদের নেতা, তিনিও তো ইন্ডিয়া থেকে বৃটিশদের তাড়াতে চান। তার চামড়াও কালো। অই শাদা পেত্নীটা কেন তাকে লেঙটা ফকির বলবে? নালিশ করলে করুক গিয়ে নালিশ। ফাদার মাহমুদকে ডেকে পাঠালে মাহমুদও বলবে, মারিয়া গায়ে পড়ে তাকে জাত তুলে গালমন্দ করেছে।

মাহমুদ বাড়িতে ফিরে এসে দেখে আম্মা এসেছেন। এত সকালেই নাস্তা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। একটা চীনে মাটির বাসন ভর্তি ছিটারুটি আর গোল করে ভাজা ডবল ডিম। আদা ও গোল মরিচের গন্ধ উঠছে চালের ছিটারুটি থেকে।

ঘরে পা দিতেই জাহানারা বলল, 'রাতে ভয় পেয়েছিলি?'

'বা রে ভয় পাবো কেন? এ বাড়িতে আমি সব সময়ই থাকছি না?'

'এর আগে তো একা কখনো এ বাড়িতে থাকিসনি। আমাদের ছেড়ে এই প্রথম একা একটা খালি বাড়িতে রাত কাটালি। ভয়ে আর চিন্তায় আমি আর তোর আব্বা কি ঘুমিয়েছি ভেবেছিস? সকালেই ছুটে এলাম।'

'কই আমি তো ভয় পাইনি। তবে এখানে ঠান্ডা একটু বেশী। এতো

গাছপালা। সারারাত টুপ টুপ টিনের চালে পানির ফোঁটা পড়ে। শুনতে খুব ভালো লাগছিল। পেঁচা ডাকছিল ভয়ের ডাক। কিন্তু আমার কি যে ভালো লাগছিল আম্মা।' ডিম আঙুল দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে রুটির ভাজে রেখে মুখে পুরল মাহমুদ, 'আমি এখন থেকে এ বাড়িতেই থাকব।'

'বলে কি ছেলে?' অবাক হয়ে গেল জাহানারা। 'এ বাড়িতেই থাকবি কিরে? এখানে প্রতি সকালে নাস্তা নিয়ে আসবে কে? তোর জন্য আমাদের চিন্তা হবে না? অত বড় বাড়িতে একা কেউ থাকে?'

'একাই বা থাকলাম কোথায়? আমাদের কোহিনুর আর হাঁস-মুরগীরা আছে না? জানো আম্মা, আমি যে ওদের জন্যই গত রাতে এখানে থেকেছি ওরা বুঝতে পেরেছে। সকালে সবাই কি খুশী! খুদকুড়ো খেয়ে কেউ উঠোনে আর পুকুরে নেমে টই টই করছে। আমরা এদের যেভাবে একা ফেলে যাই একদিন দেখো পশ্চিমের জংলা থেকে শেয়াল আর বাঘডাশা এসে খেয়ে ফেলবে। আমি এদের পাহারা দিতে বাড়িতেই থাকবো। তোমরা কেন যে ভয় পাও?'

মা দেখল, ছেলেটা আসলে তার মামু বাড়িতে কেন যেন ছোটো বেলা থেকেই খাপ খাওয়াতে পারে না। সে জন্য থেকেই কেমন নিরিবিলি পছন্দ করে। একটু ফাঁক পেলেই নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় এসে চুপচাপ বসে থাকে। পাখি দেখে, পতঙ্গ দেখে আর গাছের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবে। আর যখন পড়াশোনা করে তখন একেবারে ডুবে যায় বইয়ের ভেতর। ছেলেটার স্বভাবই যেন কেমন?

'ভয় না পেলেও তোর এ বাড়িতে একা থাকার ব্যাপারে তোর আব্বার বারণ আছে। আজ থেকে রাতের বেলা তোর সাথে আমাদের মসজিদের তালেবেলেম ছেলেটা, অই যে ইমাম সাহেবের খিদমত করে আর মসজিদের বারান্দায় একা শুয়ে থাকে, ও থাকবে। ওরও বোধহয় শোয়ার জায়গা নেই। ইমাম সাহেবকে বললে খুশী হয়ে তোর সাথে থাকতে পাঠিয়ে দেবে।' ছেলের জন্য একটা ব্যবস্থা বের করতে পেরে জাহানারা খুশী, 'ও এসে থাকলে তোর লেখাপড়ায় মনযোগ নষ্ট হবে না তো?'

'বা রে, রাতে এসে থাকলে ক্ষতি হবে কেন? আমি তো অনেক রাত জেগে পড়ি না। ও এলে শুয়ে পড়ব।'

'তাহলে আজ থেকে এ ব্যবস্থাই থাকল। এখন নাস্তাটা খেয়ে নে। আর দুপুরে ঠিক সময় ও বাড়িতে খেতে আসবি। সবার পরে গেলে তোর পাতে কি দেব? জানিস না তোর মামুর বাড়িতে এক শ' মানুষের পাত পড়ে?'

'জানি। সে জন্যই তো ও বাড়ি আমার ভালো লাগে না। মনে হয় সবাই

'আমার খাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।'

'তোর নানা যে আদর করে তখন তোর পাতে এটা ওটা তুলে দিত। সাত শরিকের ঘর না, হিংসেতো একটু হতোই।' জাহানারা ছেলেকে ও বাড়ির বাস্তব অবস্থাটা বোঝাতে চাইল, 'তাহলে এতে তোর লজ্জা পাবার কি আছে। তোর আব্বা আর আমি দিনরাত ওদের ভালর জন্য খাটছি না? তাছাড়া ওটা তোর মামু বাড়ি লোকে বলে না, মামু-ভাগ্নে যেখানে, ভূতপ্রেত নেই সেখানে? তুই তো মামুদের থেকে আলাদা থাকতে ভালোবাসিস। সারাদিন বই আর বই। এত পড়ে শেষে না তোর আবার বিমার পয়দা হয়?'

'তুমি কি যে বল না আম্মা, পড়লে মানুষের বিমার হয় বুঝি? দেখো এবার আমি ফার্স্ট হব। ঐ মারিয়া মেয়েটা, ফেনকচুর মত শাদা মুখওয়ালীকে এবারও ফার্স্ট হতে দেব না। ওর ইংরেজী জানার গর্ব আমি ভেঙে তবে ছাড়ব। আমাকে বলে কিনা আমার গায়ে ছাগলের দুধের গন্ধ? আমি ওকে এবারের ফাইনালে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। ইংলিশে এট্টিফাইভ না তুলে ছাড়ব না।'

ছেলের কথায় জাহানারা না হেসে পারল না, 'ওর সাথে কেন বাঁধিয়েছিস?' জাহানারা জানে সায়েবদের মেয়ে হলেও মারিয়া খুব ভালো মেয়ে। মাঝেমধ্যে মোল্লাবাড়িতে এলে জাহানারার রান্নাঘরে এসে চুপ করে বসে তার এদেশীয় রান্না দেখে। মাছ মাংসে বাগাড় বা সম্ভার দেয়ার সময় চোখ ছানাবড়া করে কেশে ওঠে। জাহানারা প্লেটে তুলে কিছু খেতে দিলে না করে না। চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে বলে, 'খুব হট আন্টি, তবে খুব মজার।' জাহানারা হেসে মারিয়ার পাতে আরও এক টুকরো মাছ বা মাংস তুলে দ্যায়। সায়েবসুবের বাচ্চা হলে কি হবে, মেয়েটা আসলে এতীম। থাকে যদিও মিশন হোস্টেলে, কিন্তু কেউ যে খুব আদর করে কিছু খেতে দ্যায় তেমন মনে হয় না।

'ওর সাথে ইংরেজীতে তুই পারবি কেন, ওর মাতৃভাষাই তো ইংলিশ।' হেসে ছেলের পিঠে হাত বুলালো জাহানারা।

'তাতে কি, মুখে বলতে পারলেই বুঝি পরীক্ষায় নম্বর ওঠে? লিখতে হয় না। ওর চেয়ে আমি শুদ্ধ ইংরেজী লিখি। ও তো ইংরেজী ব্যাকরণের কিচ্ছু বোঝে না। ফাদার ওকে কতবার ভুল বানানের জন্য ধমকেছেন।'

'তাই বুঝি?'

'ঘোষ পাড়ার কংকা এলে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

ছেলের কথায় হেসে গড়িয়ে গেল জাহানারা। ছেলের দর্পটা তার বেশ ভালোই লেগেছে। ছেলে কিনা জাত সায়েবের বাচ্চাকে ইংরেজিতে হারিয়ে দেয়ার সাহস রাখে।

৮

তৈমুর দোকানে বসে হিসেবের খাতাপত্র দেখছিল। এ সময় ঝড়ের বেগে সাফ্‌ফাত, তৈমুরের মেজো শালা এসে দোকানে ঢুকেই বলল, 'দুলাভাই, কাল আমাদের সেমিফাইনাল ইয়াংম্যান ক্লাবের সাথে। এ খেলায় জিততে না পারলে আমার মান-ইজ্জত কিছু থাকবে না। ঢাকা থেকে ইউজিনকে আনতে হবে। আমাকে দু' শ' টাকা দিন। চাঁদা।'

তৈমুর শালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দোকানে এসে লাফিও না, শান্ত হয়ে বসো।' তৈমুরের ফারসী হুকোয় দোকানের গোমস্তা ফিরোজ মিয়া একটা জ্বলন্ত কল্কে বসিয়ে দিলে তৈমুর হুকোয় টান দিতে দিতে শালার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে উদাসীনতার ভান করল, 'তুমি আর গাঁয়ের কয়েকটি বেয়াদব মিলে গাঁয়ের টিমটা ভেঙে মোহামেডান স্পোর্টিং করেছো। আমি মৌড়াইল ক্লাবের সমর্থক। আমার কাছে চাঁদা চাইতে লজ্জা করে না?'

'আমি জানি, আপনি না করবেন। মোহামেডান ভাল খেলছে এটা আপনি আর গাঁয়ের কিছু লোক সহ্য করতে পারেন না। বণিক পাড়ার হিন্দু ছেলেরা গিয়ে ইয়াংম্যান করেছে। কই তাদের তো কিছুই বলতে পারেন না? ওরাও তো মৌড়াইল স্পোর্টিং ভেঙেই আলাদা ক্লাব করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাবেক চেয়ারম্যান উমেশচন্দ্র ওদের অর্থ জোগাচ্ছে। জমিদার বিহারী বাবু ওদের পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। আমাদের দোকান থেকে চাইতে এলে আপনি মৌড়াইল ক্লাবের কথা তোলেন। আব্বা থাকলে কিন্তু আমাকে দিতেন।' কথা বলতে বলতে সাফ্‌ফাত উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা আসি।'

বলেই ঝড়ের বেগে সাফ্‌ফাত বেরিয়ে গেল।

গোমস্তা ফিরোজ হুকোটা তৈমুরের সামনে থেকে সরিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে দ্রুত কয়েকটা টান মেরে কাশতে কাশতে বলল, 'কাজটা কি ভালো করলেন মহাজন? কিছু তো দিয়ে দিলেই পারতেন। শহরে ফুটবল খেলা নিয়ে কেমন উত্তেজনা চলছে দেখতে পাচ্ছেন না? ইয়াংম্যান ক্লাব ঢাকা থেকে হায়ার করে প্লেয়ার এনেছে। মৌড়াইল ক্লাব ভেঙে এখন তিনটি দল হয়েছে। এখন আপনাদের গাঁয়ের টিম ভেঙে গেছে বলে ছোট মিয়াকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তবুও তো মোহামেডান করে তিনি আপনাদের গাঁয়ের মান বাঁচাচ্ছেন। দু'শ'

চাইতে এসেছিল পঞ্চাশ দিয়ে দিলে পারতেন। যখন বাইরে থেকে হায়ার করে প্লেয়ার আনছে তখন টাকা তো দরকার?

তৈমুর গম্ভীর হয়ে থাকল, কোনো কথা বলল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে গোমস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাশে এখন কত আছে?'

'শ' পাঁচেক হবে বলে মনে হয়।'

'তিন শ' গুণে আমাকে দাও।'

মহাজনের কথায় ফিরোজ টাকা গুণে তার হাতে দিল।

'আজ আর দোকানে আসব না। পাইকাররা এলে ঠিকমত মাল বুঝিয়ে দিও। কেউ কিছু বাকী রাখতে চাইলে দিও।'

'জ্বি মহাজন।'

গোমস্তাকে নির্দেশ দিয়ে তৈমুর দোকান থেকে সোজা শ্বশুর বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। বাড়িতে পৌছেই বুঝল বা'র বাড়ির ঘরে ছেলে-ছোকরাদের ভিড়। মোহামেডানের কোনো অফিস বা ক্লাবঘর না থাকায় পাড়ার বেয়াদব ছোকরারা যে তার শ্বশুরের বসার দালানটিকেই এখন ক্লাবঘর এবং হায়ার করে আনা খেলোয়াড়দের আস্তানা বানিয়েছে তা তৈমুরের জানা ছিল।

তৈমুর ওদিকে না গিয়ে সোজা অন্দরে ঢুকে জাহানারার সামনা-সামনি হল।

'তোমার ভাই সাফ্‌ফাতকে ডাকো।'

'কি ব্যাপার?'

'কাল ওদের সেমিফাইনাল, চাঁদা চাইতে গিয়েছিল। আমি দিইনি। এখন দেখছি সারা শহরে খেলা নিয়ে উত্তেজনা। কিছু টাকা তোমার ভাইকে বোধহয় দেয়া দরকার।'

স্বামীর কথায় জাহানারা আর কথা না বলে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই সাফ্‌ফাতকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এল। তৈমুর গায়ের পিহরান খুলে খাটের উপর বসা। সাফফাতকে দেখেই তৈমুর বলল, 'বাইরে থেকে প্লেয়ার আনার জন্য লোক পাঠিয়েছো?'

'আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে যাবে'

'কয়জন দরকার?'

'দু'জনকে আনলে ভালো হতো, কিন্তু অত টাকা আমরা কোথায় পাবো? ধারকর্জ করে এখন একজনকেই আনতে লোক পাঠাচ্ছি। এখন সেন্টারে আমিই খেলব আর রাইট আউটে ম্যাকোয়া। ইন-এ খেলার জন্য ইউজিনকে পাওয়া গেলে জেতার সম্ভাবনা ছিল।'

'সম্ভাবনা বললে হবে না। তোমার টিমকে জিততে হবে। টাকা যা লাগে

তোমার বোন দেবে। একদিনের মধ্যে যেখানে যেখানে ভালো খেলোয়াড় পাওয়া যায় আনতে লোক পাঠাও।'

ভগ্নিপতির কথায় হতচকিত হয়ে সাফফাত জাহানারার দিকে তাকালে জাহানারা হাসল, 'খেলছিসই যখন তখন তোর মনের মত করে টিম সাজা, টাকা আমি দেব। তোর দুলাভাই তো আর আমাদের কারবারের মালিক না যে তোকে যখন যত চাস দিয়ে দেবে। তুই প্লেয়ার জোগাড় করে আন, টাকা আমার কাছ থেকে নিবি।'

সাফফাত বোনের কথা শুনে একবার তৈমুরের চেহারার দিকে চোখ তুলে মেজাজ বোঝার চেষ্টা করল। সেখানে হাসির কোনো রেখা নেই।

'এই লও তিন শ', এটা আমার ব্যক্তিগত হিসেব থেকে দিচ্ছি। আর তোমার বোন তো দিচ্ছেই। হেরে এসে বলো না টাকার জন্য হেরে গেলাম।'

'হারবো কেন? আপনি তো মৌড়াইল টিম ভেঙেছে বলে আমাদের খেলা দেখতেও যান না। আমরা মন্দ খেলি না।'

তৈমুরের হাত থেকে টাকার বাণ্ডিলটা নিল সাফফাত, 'ওপাড়ার বণিকরা অনেক টাকা ছড়িয়ে প্লেয়ার আনছে। আগে যদি টাকার আশ্বাস পেতাম তাহলে বেণেদের দেখিয়ে দেয়া যেত। হারামজাদা মালাউনরা নাকি কলকাতার মোহনবাগান থেকে প্লেয়ার আনার জন্য লোক পাঠিয়েছে।

'তাই নাকি, তাহলে তো ব্যাপারটা বেশ গুরুতর বলে মনে হচ্ছে সাফফাত মিয়া। এ খেলায় অন্তত ড্র রেখেও যদি ফাইনালে যেতে পারো, আমি কলকাতার মোহমেডান থেকে রশিদকে তোমাদের সাথে ফাইনালে খেলার জন্য নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।'

তৈমুর হঠাৎ যেন একটু উত্তেজিত।

জাহানারা বলল, 'খেলা খেলা করে শেষতক তুই আর লেখাপড়া করতে না পারলে তখন কিন্তু সকলে দোষ চাপাবে তোর দুলাভাইয়ের ওপর। এ কথাটা মনে রাখিস ভাই।'

'আসি দুলাভাই। সুখবরটা সবাইকে গিয়ে শুনিয়ে দিই।'

সাফফাত আনন্দে আটখানা হয়ে বেরিয়ে যেতেই জাহানারা বলল, 'এমন কড়া শাসনের মধ্যে রেখে শেষে শালাকে আবার নিজেই পাগলামিতে উস্‌কালে?'

'সারা শহরের লোকেরা আমাদের গাঁয়ের খেলাধুলার কৃতিত্বে এতদিন হিংসে করে এসেছে। এখন মুরুব্বীরা কেউ বেঁচে নেই বলে শহরের দু'-একটি বর্ধিষ্ণু মহল্লা মৌড়াইল গ্রামকে হারিয়ে দেয়ার স্বপ্ন দেখছে। তোমার ভাইয়েরা কিছু না জেনেই এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য উস্‌কালাম। শুধু টাকার জোরে জেতা

যায় না আমি জানি। তবে আজকাল শুনছি তোমার দু'ভাই-ই নাকি খুব ভালো খেলে, যদিও আমি দেখার ফুরসত পাইনি। ভালো খেললে খেলুক। যদি খেলেও মোল্লাবাড়ির গৌরব ধরে রাখতে পারে তবে খেলুক না। ওরা তো আর বিদ্বান হয়ে চাকুরী করতে যাবে না! ঘরে বসে ঘরের টাকাই ওড়াবে। এর চেয়ে ভালো প্লেয়ার হয়ে নামডাক কিনতে পারলে আমি কেন বাধা দিয়ে ওদের পছন্দ ঠেকাতে যাব?'

তৈমুরের মুখের গাম্ভীর্যময় আদল থেকে যেন একটা গ্রাম্য প্রতিহিংসার ছটা ছিটকে বেরিয়ে এল। জাহানারা স্বামীর মুখের দিকে কতক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলল, 'তোমাকে মাঝে মধ্যে তোমার শ্বশুরের জিদে পেয়ে বসে। আব্বাও বেঁচে থাকলে আজ এটাই করতেন'। হারমানা বোধহয় এবংশের রক্তের মধ্যেই নেই। আমার একটা কথা মনে রেখো, শালাকে উৎসাহ দিচ্ছ দাও, তবে সীমা ছাড়িয়ে যেতে দিও না। গতকাল বিকেলে তোমার বড় শালা শওকতকে দেখলাম আমার বড় আম্মার সাথে ভেতর বাড়ির ঘাটলার শানে বসে কি যেন ফিসফিস করছে। আমি মাস্টার সাহেবের কাছে গিয়ে পড়তে বসার তাগাদা দিলে আমার মুখের ওপর বলে দিল তার মাথা ধরেছে। আজ রাতে মাস্টারের কাছে যাবে না।'

তৈমুর এ কথার কোনো জবাব দিল না।

পরের দিন সকাল থেকেই বাড়িতে ভিড়। প্রায় শ'খানেক উঠতি বয়সের তরুণ বাইরের বিল্ডিংটা সরগরম করে রেখেছে। বেলা আড়াইটায় চট্টগ্রামগামী মেল ট্রেনে ঢাকা থেকে আগত ইউজিন ও ম্যাকোয়াকে পেয়ে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে সবাই। এমনকি মাহমুদের মত নিরীহ ছেলেরাও প্লেয়ারদের ফাইফরমাশ খাটার জন্য বা'র বাড়িতে জমায়েত হয়েছে। মাহমুদ সাধারণত খেলাধূলায় নিজে কদাচ উৎসাহ দেখায়। আজ অবশ্য মামুদের হুকুম তামিল করার জন্য এক পায়ে খাড়া। ছোট মামু সারোয়ার সকালেই তার শার্টের পকেটে খেলা দেখার জন্য দু'আনার কম্প্লিমেন্টারী টিকেট ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছে, 'খেলা দেখতে যাস কিন্তু। এমন খেলা আগে নিয়াজ পার্কে কোনোদিন হয়নি। সাবধান, আজ গল্পের বই নিয়ে বসবি না। এটা আমাদের গাঁয়ের মান-সম্মানের লড়াই। আসলে আমাদের বাড়ির সাথে সারা শহরের লড়াই। তোর তো আবার ওসবের খোঁজ-খবর নেই। খালি ফালতু গল্পের বই পড়া!'

সারোয়ার মামুর দেয়া টিকেটটা মাহমুদ পকেট থেকে খুলে একনজর দেখল

'তোর বন্ধু-বান্ধবকে মাগনা নিতে চাইলে আরও দু'টো টিকেট তোকে দিতে পারি।'

'লাগবে না।'

'তোর তো আবার কোনো বন্ধু নেই, কেবল বই আর মিশনের মেয়ে আর ঘোষপাড়ার গোয়ালাদের মেয়ে কংকার সাথে বাঘবন্দী খেলা।'

হাসল সারোয়ার। ভাগনের প্রতি যে একটা গভীর টান আছে তা হাসিটা থেকেই আন্দাজ করা যায়।

'আচ্ছা মামু, খেলায় আমাদের টিম জিতবে তো? শুনলাম ইয়াংম্যানরা কলকাতার মোহনবাগান থেকে কাকে নিয়ে এসেছে?'

'আনুক না, আমাদের ব্যাকে দক্ষিণ পাড়ার হাবিব আর সিরাজ আছে না। ফাউল করে পা ভেঙে দেবে।'

'তাহলে মারামারি বেঁধে যাবে না?'

'আরে বোকা, আমরা তো মারামারিই চাই।'

'মারামারি করে সেমিফাইনালে জেতা যায়?'

'আমরা দরকার হলে মারামারি করে ফাইনালেও জিতবো। আমাদের জিততে হবে। সারা শহর আমাদের বিরুদ্ধে কেন বুঝিস না? শহরের সব দোকানপাট হাট বাজারে আমাদের গাঁয়ের লোকেরা কর্তৃত্ব করে। এ জন্য পইরতলা, কাজীপাড়া, বণিক পাড়ার বণিকরা, উলচাপাড়া, মধ্যপাড়ার উঠতি ব্যবসায়ীরা আমাদের ক্ষমতা খর্ব করতে চায়। মনে করে মৌড়াইল গাঁয়ের মোল্লাবাড়ির মুরুব্বীরা নেই। আমাদের দাপটের দিন শেষ হয়ে গেছে। খেলাটা তো আসলে আমাদের বাড়ির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, বুঝলি না?'

মাহমুদ কিছু বুঝতে না পেরে ছোট মামুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তাহলে তো খেলার মাঠে হাঙ্গামা বেঁধে যেতে পারে?'

'পারে মানে? আমাদের হারাতে চাইলে আলবাৎ আমরা সবাইকে পেটাবো। আমাদের জিততে হবে, বুঝলি না?'

'আমার তাহলে খেলা দেখে কাজ নেই।'

'কাপুরুষ! দেবো একটা থাপ্পড় লাগিয়ে। চল আমার সাথে স্টেশনে। কলকাতা থেকে ওদের টিমে কারা আসছে দেখি।'

ছোট মামু সারোয়ার মাহমুদের হাত ধরে টেনে স্টেশনের দিকে রওনা দিল।

এ হল সকাল বেলার ঘটনা।

এখন বেলা তিনটেয় মাহমুদ নিজেও উত্তেজিত। মোহামেডানে খেলার জন্য

দু'জন সুদর্শন প্লেয়ার এসেছেন, ম্যাকোয়া ও ইউজিন। দু'জনই আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়। নিজের গাঁয়ের লোকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে মাহমুদ এখন নিজেও উত্তেজিত। খেলার নেশায় আজ সে নিজের বাড়ির কথাও ভুলে গেছে। আজ কোহিনূরকে বাইরে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়নি। বাড়িতে রেখে কাঁঠালের খেঁতা ও ফেন খেতে দিয়ে এসেছে। আর মোরগ-মুরগীগুলোকে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার সময় খোঁয়াড়ে তোলার জন্য মসজিদের তালেবেলেম ছেলেটাকে বলে এসেছে। আজ থেকে মায়ের ব্যবস্থামত সে মাহমুদদের ঘরেই থাকবে।

বেলা সাড়ে চারটের দিকে মোহামেডান ও ইয়াংম্যান ক্লাবের খেলা শুরু হতেই উত্তেজনায় নিয়াজ মাঠের অসংখ্য দর্শক নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকল। হুইসেল পড়ার সাথে সাথেই মাহমুদ দেখল, তার মেজো মামু সাফফাত সেন্টারের গোল রেখা ভেদ করে একটু এগিয়েই মাঠের ডান দিকে অপেক্ষমান ইউজিনকে পাস দিয়ে নিয়ে দৌড়ে প্রতিপক্ষের সামনে পৌঁছতেই ইউজিন কয়েকজনকে কাটিয়ে সাফফাতকে বল গড়িয়ে দিতেই সাফফাত মুহূর্তমাত্র বল স্টপ করে সোজা এক অভাবনীয় কায়দায় পেনাল্টি এরিয়ার দু'হাত দূর থেকে উঁচু করে গোলপোস্টের দিকে কিক মারল। দম বন্ধ করে রাখা দর্শকদের মধ্য থেকে ঐকতানের মত বেজে উঠল, 'গোল গোল গোল।' মনে হয় এ অভাবনীয় দৃশ্যে রেফারীও বুঝি ক্ষণকাল বিহ্বল থেকে বাঁশী বাজিয়ে আঙুল তুলে সেন্টারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এবার মৌড়াইল গাঁয়ের দর্শকবৃন্দ মাঠের যে অংশে সাধারণত জমায়েত সে অংশটা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

কেউ ভাবেনি যে মোহামেডান ও ইয়াংম্যান ক্লাবের মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলায় এমন একটা পরিচ্ছন্ন গোল হবে। সাধারণত দু'টি দলই পেনাল্টি এরিয়ায় প্রতিপক্ষকে বাগে পেলে ফাউল না করে ছাড়ে না। রেফারীর পর্যন্ত সাহস থাকে না ন্যায়সঙ্গত পেনাল্টি ডিক্লারের। যাদের বিরুদ্ধেই পেনাল্টি বাজাবে তারাই রেফারীকে মারতে আসবে।

সেদিনের খেলা আর জমল না। কেউ প্রতিপক্ষের ব্যাকের কাছে পৌঁছবারই সুযোগ পেল না। সেন্টার ফরোয়ার্ডরা পেনাল্টি রেখার কাছাকাছি গেলেই কোত্থেকে যমের মত অন্য কেউ এসে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তার ওপর আঘাত হানে। আহত খেলোয়াড় বেহুঁশ হয়ে মাঠে পড়ে থাকেন। রেফারী পেনাল্টি দেয়ার সাহস হারিয়ে শুধু ফাউল ডিক্লিয়ার করে নিজের জান বাঁচান। এ যাত্রা মোহামেডান ১-০ গোলে জিতে ফাইনালে চলে যায়। আর শহরে ছড়িয়ে পড়ে মোল্লাবাড়ির বিরুদ্ধে দারুণ উত্তেজনা।

এ পাড়ার লোকেরা বেশ চিন্তা-ভাবনা করে বাজারে বেরোয়। কারণ শহরে

পরাজয়ের উত্তেজনা। তবে মৌড়াইল মহল্লার লোকদের গায়ে হাত তোলার সাহসও কারো নেই। কারণ এ গাঁয়ের কাছে শহরের লোকদের বার বার আসতে হয়। এ মহল্লাতেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন, এসডিও'র বাংলো, জর্জ ফিফ্থ হাই স্কুল ও নিয়াজ পার্ক। তবুও ক্ষণ উত্তেজনায় শহরের কাঁপুনি থামে না। যারা শহরের অন্নদা স্কুল কিংবা এডোয়ার্ড স্কুলের ছাত্র তাদের অভিভাবকগণ পুত্র-কন্যাদের অন্তত একটা দিন স্কুলে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখেন। কে জানে, মাথা গরম শহর কখন কাকে অপমান করে বসে। ঘরে ঘরে খেলার উত্তেজনা। শহরের লোকেরা ভাবে, অন্যায়ভাবে তাদের হারিয়ে দেয়া হয়েছে। গায়ের জোরে। অথচ মাহমুদ দেখেছে কি নৈপুণ্যের সাথে মেজো মামা প্রতিপক্ষের গোলের ভেতর বল ঢুকিয়ে দিয়েছে।

পরের দিন নিজের স্কুলে গিয়ে মাহমুদ শুনতে পেল ফাদার জোনস্ পাড়ার টিম বিজয়ী হওয়ায় স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। মাহমুদ স্কুলের বারান্দা থেকে নামার সময় দপ্তরী রোশন মিয়া বলল, 'আপনাকে ফাদার লাইব্রেরীতে ডেকেছেন।'

মাহমুদের বুকটা ধক করে উঠল। নিশ্চয়ই সাদা পেত্নীটা ফাদারের কাছে নালিশ দিয়েছে। মাহমুদ ভয়ে ভয়ে লাইব্রেরীর দরজায় দাঁড়াতেই ফাদার ডাকলেন, 'ভেতরে এস।'

মাহমুদ ফাদারের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে তার পা কাঁপছে। ফাদার এক্ষুণি যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি সাদা চামড়ার মানুষদের হিংসা করো কেন? কিংবা তার স্বভাবসুলভ ভাষায় তুমি মারিয়াকে অপমান করেছো, তার কাছে ক্ষমা চাও। তখন কেমন হবে?

ফাদার মুখ তুলে তাকালেন। মুখে মৃদু হাসি, 'তুমি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ডেফোডিল কবিতাটির যে ব্যাখ্যা লিখেছো তা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি তোমাকে 'ঈশপস ফেবল' বইটি উপহার দেয়ার জন্য ডেকেছি।'

মাহমুদ হাফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, মারিয়া মুখে যাই বলুক, ফাদারকে কিছু বলেনি।

৯

শেষ পর্যন্ত সয়-সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারে আনুর জামাই যে আশা নিয়ে এসেছিল এর কিছুরই আপাতত সম্ভাবনা নেই দেখে সে অনেকটা হতাশ

হয়েই বড় আম্মার ঘরে গিয়ে হাজির হল। আমজাদ মিয়াকে সকালে নাস্তা খাওয়ার পুর্ব মুহূর্তে নিজের কামরায় ঢুকতে দেখে বড় আম্মা একটু অবাকই হলেন, 'কি ব্যাপার আমজাদ মিয়া? কি মনে করে?' মোড়াটা জামাই মিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বড় আম্মা বললেন, 'বসুন। আপনারও বোধ হয় ছুটি ফুরিয়ে এল...।'

'এ ব্যাপারেই আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি বড় আম্মা। মাসও শেষ। আগামী মাসের পহেলা তারিখ আমার কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।'

'এবারও কি আনুকে ময়মনসিংহের গাঁয়ের বাড়িতে রেখেই আপনি কলকাতায় যাবেন?' শাশুড়ীসুলভ তীর্যক ভঙ্গীতে একবার মেয়ে জামাইয়ের দিকে তাকালেন বড় আম্মা, 'সারা বছর আমাদের মেয়েটাকে গাঁয়ের বাড়িতে রেখে আপনি কলকাতায় পড়ে থাকবেন এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আমজাদ মিয়া। জানুর আব্বা বেঁচে থাকলে মেয়েকে কিন্তু এভাবে একটা অজ পাড়াগাঁয় ফেলে রাখতে দিতেন না। লেখাপড়া শেষ করে আপনি যখন কলেজে চাকরি নিলেন তখন জানুর আব্বা খুব খুশী হয়েছিলেন এই ভেবে যে আপনি আনুকে আপনার নিজের কাছে নিয়ে রাখবেন।'

বড় আম্মার কথায় একটু হকচকিয়ে গেল আমজাদ। সে অন্য বিষয় নিয়ে আনুদের এই প্রভাবশালিনী সৎ মায়ের কাছে এসেছিল। আমজাদ ভাবেনি যে বড় আম্মা তার কামরায় ঢোকামাত্রই আনুর গাঁয়ে পড়ে থাকার প্রসঙ্গটি উথাপন করবেন।

আমজাদ আমতা আমতা করে বলল, 'আনুকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটু অসুবিধে আছে বড় আম্মা। আমার গাঁয়ের বাড়িটা একেবারে অনাবাদী ছাড়া বাড়ির মত পড়ে আছে। তাছাড়া আমার নিজের কিছু জমিজমাও আছে। এসব দেখাশোনা করার জন্য বাড়িতে যারা আছে তাদের ওপর ভরসা রাখতে পারি না।'

'আপনার আম্মা তো এখনও বেঁচে আছেন। শুনেছি বেয়াইন বেশ শক্তমক্তই আছেন...।'

'তাহলেও আনুকে তার দরকার।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি বিয়ের সময় আপনাদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল আমাদের মেয়েটাকে আপনি আপনার কর্মক্ষেত্র শহরে বন্দরে যেখানেই আপনি থাকেন আপনার সাথেই রাখবেন। কারণ আমাদের মেয়েকে আমরা গ্রাম্য গৃহস্থালীর উপযোগী করে গড়ে তুলিনি। তারা প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে। এর জন্যই তার বাপ আপনার পড়ার খরচ বাবদ বেপরোয়া খরচ করে আপনাকে

এমএ পাস করিয়েছে। এরপরও যদি আনুকে গিয়ে আপনার ঘর গৃহস্থী ঠেলতে হয়, ধান ভানতে হয়, সেটা কিন্তু আমাদের কারো চোখেই ভাল ঠেকছে না।'

'না না আম্মা, আনুকে আমাদের বাড়িতে কিছুই করতে হয় না। আমাদের ধান পাটের লওয়াথোয়া করার জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া আমার এখন নতুন চাকরি। একটু সচ্ছলতা পেলেই আমি আপনাদের মেয়েকে শহরে নিয়ে যাব।' আমজাদ মোড়াটায় বসল, 'ভেবেছিলাম যদি এখানে ভাগ বাটোয়ারাটা হয়ে যায় তাহলে আগামী মাসেই কলকাতায় নিয়ে বাসা বাড়ি করে থাকব।'

এবার বড় আম্মার বুঝতে অসুবিধে হল না যে আমজাদ সকালের নাস্তা না করেই কেন তার কামরায় হাজির হয়েছে।

'ও আপনি তাহলে আপনার স্ত্রীর পাওনার ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছেন। দেখুন জামাই মিয়া, আমি এদের সৎ মা। আমি নিঃসন্তান। সম্পত্তি এখন ভাগ হলে লাভবান হতাম আমি। আমি সেটা চাইও।'

এ সময় বড় আম্মার নিজের কাজের মেয়ে নাস্তার প্লেট ইত্যাদি খাটের ওপর দস্তরখান বিছিয়ে রেখে গেল।

'নিন বিসমিল্লাহ্ করুন। যে কথা বলছিলাম, আমিও মোল্লা সাহেবের পুঁজিপাট্টা যা কিছু আছে শরিকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে বলি। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাতবর ব্যক্তিরা ছোটোবিবির এতিম ছেলেমেয়ে আর আপনার নিজের শালাশালীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখনই ভাগবাটোয়ারা করতে সম্মত হননি। আমি তাদের অসম্মতির পরোয়া না করলেও পারতাম। কিন্তু আমি আমার সতীনের ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তৈমুর মিয়ার হেফাজতের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি।' আমজাদের পাতে গরম পরোটা ও মুরগীর ঝোল তুলে দিলেন বড় আম্মা, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এতে আপনি সন্তুষ্ট নন। আপনি তাহলে শহরের মাতবরদের কাছে গিয়ে আপনার স্ত্রীর অংশ আলাদা করে দিতে বলুন।'

আমজাদ ততক্ষণে নাস্তার প্লেটে হাত লাগিয়েছে। ঝোলে ভিজিয়ে সে পরোটার অংশ মুখে পুরে বলল, 'না আমি বলছিলাম কি দোকানপাট আর নগদ টাকার ব্যাপারটা না হয় ব্যবসার খাতিরে এখন তৈমুর ভাইয়ের হাতেই থাক। কিন্তু প্রায় একশোদেড়শো বিঘা জমি তো এখন ভাগবাটোয়ারা করে দিলে পারে।'

'এই আরেকটা ভুল আপনি করছেন জামাই মিয়া, খেত খামার, হল স্থাবর সম্পত্তি। এর বাটোয়ারা এই মুহূর্তে কি দরকার? এতো আর কেউ লোপাট করে

দিতে পারছে না। যেমন আছে তেমনি দশ বছর পরেও থাকবে।' বড় বিবি তার মুখটা হঠাৎ আমজাদ মিয়ার কানের কাছে এগিয়ে আনল, 'আসল বিষয় হল মোল্লা সাহেবের অস্থাবর সম্পত্তি। নগদ টাকা পয়সা। তৈমুর সকলেরই এখন খুব বিশ্বস্ত, কিন্তু বিশ্বস্ত কতদিন থাকতে পারবে? সিন্দুকে যে টাকা ছিল এর বাইরেও মোল্লা সাহেবের যে লাখ লাখ টাকা ছিল না এর প্রমাণ কি? অনেক ব্যবসায়ীই মোল্লা সাহেবের টাকায় শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাচ্ছে। একথা আমার ভাইয়েরা আমাকে বলেছে। এ টাকার সন্ধান একমাত্র তৈমুর ছাড়া কেউ জানে না। ক্যাশের যে হিসেব রয়েছে মাতবরদের সামনে এর বাইরের হিসেব তো তৈমুর কারো কাছে ভাংছে না। যদি পারেন সেটার খোঁজ করুন। তখন আপনাকে খেরো খাতার ভয় দেখাতে পারবে না, বুঝলেন কিছু?'

'আরে বড় আম্মা, আপনি তো আমাকে একটা নতুন কথা বললেন, তাই তো, আমি তো বিষয়টি চিন্তাই করিনি? আনু তো মনে করে তার ভগ্নিপতি একজন ফেরেস্তা। আমার শ্বশুরের সব লেনদেনের বিষয়টা আপনাদের বড় জামাই ছাড়া কেউ জানে না। এটা না জেনে তো অংশীদাররা একজনের ওপর কায়কারবারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। আপনি তো আমার চোখ খুলে দিলেন বড় আম্মা।'

বলতে বলতে তার নিজের পায়ে কদমবুসী করার জন্য আমজাদকে নুয়ে পড়তে দেখে বড় আম্মা বললেন, 'আরে জামাই মিয়া করেন কি, থাক আর কদমবুসী করতে হবে না। শুনুন, আমার কথা নিয়ে এখন কোনো হৈ হল্লা বাঁধিয়ে বিষয়টা মাটি করবেন না। এতে তৈমুর সতর্ক হয়ে যাবে। সে ভাবছে আমরা কেউ কিছু জানি না। কাগজপত্র ছাড়া যেসব লেনদেনে আপনার শ্বশুরের লাখ লাখ টাকা বাজারে খাটছে, সে ভেবেছে সে ধীরে ধীরে হাতিয়ে নেবে। ঋণ যারা নিয়েছে তারাও বিষয়টা কাউকে জানাবে না। কারণ তাহলে তৈমুর ভবিষ্যতে আর তাদের কোনো পুঁজি দেবে না।'

ফিস ফিস করে কথা বলছেন বড় আম্মা। একটু আগে তিনি আনুর ব্যাপারে যে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন সে চেহারাখানা যেন মন্ত্রবলে কেউ পাল্টে দিয়েছে। ধূর্ত আমজাদ মিয়া পর্যন্ত অবাক, 'আর আমাকে কিনা আমার লেখাপড়ার জন্য নেয়া টাকার হিসেবটার ভয় দেখায়? এখন আমি নিজেই সেটা সকলকে দেখাতে বলব। আমি তো আর পুকুরচুরি করিনি, কি বলেন বড় আম্মা?'

'না ওটা দেখতে চাইবেন না জামাই মিয়া। তাহলে আপনার হিতে বিপরীত হবে। কারণ আপনি কম নেননি। সে হিসেব চাইতে গেলে আপনার শুধু টাকা-পয়সা কেন, হয়ত জমি, জমাও আর পাওনা থাকবে না। মাঝে মধ্যে আপনার

টাকা নেয়ার ব্যাপারে আপনার শ্বশুরের মত চাপা লোকও অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনিই একবার আমাকে বলেছিলেন, আমজাদটা কলকাতায় কোন্ পথে টাকা ওড়াচ্ছে আল্লাহ্ মালুম। সপ্তাহে দু'বার টাকার জন্য টেলিগ্রাম করে। মেয়েটিকে কার হাতে যে দিলাম? এ তো দেখছি আগরতলার রাজকুমারদের মত দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। অথচ এক কিষাণের ছেলে লেখাপড়ায় এগিয়েছে দেখে মেয়েটাকে দিলাম। আমার টাকা পেয়ে এখন সে নবাবেরও বাড়া চালচলন শুরু করেছে। আমি কি জানতাম আরেক প্রমথেশ বড়ুয়াকে আমি মেয়ে জামাই করেছি?' নিজেই নিজের কথায় হেসে ফেললেন বড় আম্মা, 'সে জন্যই বলছি ওসব হিসেবের খাতা দেখতে না গিয়ে আপনি ডাক্তার বাবু আর বিহারী বাবুকে আপনার সন্দেহের কথাটা জানিয়ে রাখুন। ছোটো বিবিকেও একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। তবে আমার কথা কাউকে বলবেন না। কেউ যেন না জানে যে আমি তৈমুরকে সন্দেহ করি। এতে আপনার আমার দু'জনের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে।'

এ সময় আনোয়ারা দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে বড় বিবির কামরায় ঢুকতেই দু'জনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বড় আম্মা আর আমজাদের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে গিয়ে আনোয়ারা বলল, 'শুনলাম তুমি সাত সকালে আম্মার ঘরে বসে নাস্তা খাচ্ছ...।'

তার কথা শেষ হবার আগেই বড় আম্মা বললেন, 'আরে এই যে আনু, আমি তোর জামাইকে আজ সকালে আমার সাথে নাস্তা খেতে ডেকেছিলাম। বেচারা এসেছে অথচ আমাদের নিজেদের পেরেশানীর জন্য একদিনও ওর সাথে ওদের বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে একটু আলাপ করতে পারি না। বেয়াইনের খোঁজ-খবর নিতে পারিনি। জানু কি তৈমুরকে বাজারে বিদেয় করে কামরায় ফিরেছে?'

'না, বুবু এখনও পাকঘরের কাজ করছে। তৈমুর ভাইকে আমিই খাইয়ে বাজারে বিদেয় করেছি। বুবু সাফফাতের খেলোয়াড়দের জন্য পাউরুটি আর ডিমের ওমলেট বানাচ্ছে। যাই আমি গিয়ে একটু সাহায্য করি।'

আনোয়ারা বেরিয়ে গেলে বড় আম্মা আমজাদ মিয়ার কানের কাছে মুখ এনে আবার বলল, 'সাবধান জামাই মিয়া, এসব কথা যেন আনু জানতে না পারে।'

'আনুকে জানাব, আপনি পাগল হয়েছেন বড় আম্মা?'

'আরেকটা কথা। শহরের মাতবরদের কাছে কথাটা পেড়েই আপনি আনুকে নিয়ে এবারকার মত ময়মনসিংহ চলে যান। সেখান থেকে আপনার কাজের জায়গায়। একটু ধৈর্য্য ধরে এগুতে হবে। মনে রাখবেন আপনার আর আমার মতলব হাসিল করতে হলে সবুরের দরকার। আর ফাদার জোনসের কাছে ওসব

কথা তুলতে যাবেন না। কারণ সে তৈমুরকে সাধু-সন্ত মনে করে। সে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ শুনলেই আপনাকে সন্দেহ করবে।'

'আমি জানি।'

'তাহলে খোদা হাফেজ।'

আমজাদ মহা খুশী মনে বড় আম্মার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরল তৈমুর। মুখখানা গম্ভীর। জাহানারা স্বামীর সামনে ভাত বেড়ে দিয়েই বুঝল শহরে বা দোকানে নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে। কিন্তু মুখের ওপর খাবার সময় জাহানারা সাহস করল না কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে। খাওয়া শেষ করে বিছানায় এসেই জাহানারা প্রশ্ন করল, 'খেলাধূলো নিয়ে শহরে কিছু হয়েছে নাকি?'

তৈমুর ছোট্ট জবাব দিল, 'না তো!'

'তাহলে গোমড়া মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকলে কেন? এখনও গাল ফুলিয়েই রেখেছো, একটা কথাও বলছো না?'

তৈমুর কি জবাব দেবে যেন ভেবে পাচ্ছে না।

'ক্যাশ নিয়ে কোনো গোল বেঁধেছে বুঝি?'

'আরে না। ক্যাশ তো আজকাল ফিরোজ মিয়াই মেলায়। আমি মেলাতে গেলেই গোল বাঁধে। এখন ফিরোজের হাতে দোকানের হিসেব ছেড়ে দিয়েছি।'

'তাহলে দুশ্চিন্তা করছ কেন?'

'দুশ্চিন্তা না করে আর পারছি না মাহমুদের আম্মা। কোন্ দিকটা সামলাবো বল, ব্যবসা-বাণিজ্য আর খেতখামার দেখলে তোমার ভাইদের দেখতে পারছি না। তুমি তো জানো, তোমার ভাইয়েরা আমার ডাক-দোহাই কিছু শোনে না। লোকে বলবে আমার অভিভাবকত্বের কারণেই তোমার ভাইয়েরা নষ্ট হয়ে গেল। আমি এখন কি করি? আল্লাহ্ আমার ওপর কেন এ দায়িত্ব দিলেন যা বইবার শক্তি আমার নেই?'

তৈমুর স্ত্রীর দিকে পাশ ফিরে শুতেই জাহানারা বিছানায় উঠে বসে গেল, 'কি হয়েছে খুলে বলছ না কেন?'

'কি খুলে বলব? তোমার কাছে বলার উপযোগী কথা হলে তো বলব? এমন কথা যা আমি তোমার কাছে বলতেও লজ্জা পাচ্ছি।'

'সেকি?'

'তোমার ছোটো ভাই যেটার নাক টিপলে এখনও দুধ বেরিয়ে আসবে. আজ

জানলাম সে নিয়মিত খারাপ পাড়ায় ঘোরাফেরা করছে।'

'কিসব যা তা বলছ?'

'দেখো জানু, আমি বাজারের লোক। ছোটোবেলা থেকেই বাজারের আবহাওয়ায় কেটেছে। বাজারে যা রটে তা সবার আগে দোকানদারদের কানে আসে। তোমার ভাই সারোয়ার বাজারের খানকি পাড়ার গোলাপী নামের এক কিশোরীর কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছে। শুনলাম শরাবও নাকি খায়।'

জাহানারা তৈমুরের কথায় পাথর হয়ে থাকল। তার মুখে কোনো জবাব ফুটল না। সে কিছুক্ষণ নিষ্প্রাণের মত বসে থেকে শেষে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

তৈমুর এবার সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'এটা শুনেই এতটা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এমনও হতে পারে কোনো দুষ্টু বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সেখানে যাওয়া শুরু করেছে। ভয় পাচ্ছি তো মদের নেশায় পেয়েছে বলে।'

জাহানারা কোনো জবাব না দিয়ে অন্ধকারেই ছাদের কড়িকাঠের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'আমার ছেলেটা যে এ বাড়ির আবহাওয়ার বাইরে গিয়ে একাকী আমাদের বাড়িতেই পড়ে থাকতে চায় এতে এখন আমি অখুশীই নই জানু। এর চেয়ে নিঃসঙ্গ থাকাই ভালো।'

'আমার ছেলে যেখানেই থাকুক সে ভালই থাকবে। তুমি তো আর পাপের কামাইয়ে ছেলে মানুষ করছ না।'

'তোমার কথা বুঝতে পারলাম না, তোমার ভাই কি পাপের পয়সায় মানুষ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ হচ্ছে। আমার কথা বুঝতে পারছ না?'

'বুঝিয়ে বলো?'

'জানো না? আমার বাপ মানে তোমার চাচা এক জীবনে খানকি পাড়ায় পড়ে থাকতেন? লোকে দুর্ণাম দ্যায় তিনি সেখানকার কোনো বেশ্যার পয়সাতেই নিজের মালিকের দোকানপাট কিনে বড়লোক হয়েছিলেন। তিনিও আফিমের নেশা করতেন।' জাহানারা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'তার রক্তের দোষ তো কেউ না কেউ পাবে। তুমি বৃথাই খেটে মরছ তৈমুর ভাই। আমার বাপের কিছুই থাকবে না। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সব শেষ হয়ে যাবে।'

বহুদিন যাবত জাহানারার সাথে তৈমুরের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর জাহানারাকে আগের সেই 'তৈমুর ভাই' সম্বোধনটি ছাড়াতে হয়েছিল। হঠাৎ আজ দিশেহারা মুহূর্তে জানুর এই 'তৈমুর ভাই' ডাকটি শুনে তৈমুর মনে মনে হাসল।

'অত অস্থির হওয়ার কিছু নেই। সারোয়ার এখনও ছেলে মানুষ। যাদের

পাল্লায় পড়ে সে ওপড়ায় যাচ্ছে বলে খবর পেয়েছি তারাও এ শহরের অতিশয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরই বখা ছেলের দল। ব্যাপারটা যখন বাজারে রটে গেছে তখন এর একটা বিহিত হবে।'

'কি বিহিত? তোমরা বাজারের খারাপ পাড়াটা জোর করে তুলে দিতে পারবে? ছেলেগুলোকে দুধের পুকুরে গোসল দিয়ে আনলেও এরা মানুষ হবে ভেবেছ? হবে না। আমার এখন ভয় হচ্ছে তোমাকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে কি ভয়?'

'সারোয়ার এখন তোমাকে শত্রু ভাবা শুরু করবে।'

'সেটা অবশ্য যতটুকু বুঝতে পারছি তোমার ঐ অপগন্ড ভাইটি ভাবতে শুরু করেছে। ঐ প্রসঙ্গেই তো আমি এসব কথা জানতে পারলাম।' তৈমুর এবার নিজেই বিছানায় উঠে বসল, 'যে আমাকে তোমার ভাইয়ের অধঃপতনের খবরটা বলেছে, তার কাছেই জানতে পারলাম সারোয়ার মাতাল হয়ে চিৎকার করে আমাকেই গাল দিচ্ছিল। আমি চোর, আমি তোমাদের সম্পত্তি লুটেপুটে খাচ্ছি ইত্যাদি।'

'চলো এসব ছেড়ে আমরা আমাদের ঘর-সংসারে ফিরে যাই।'

'তোমার আব্বার ব্যবসা-বাণিজ্য আর তোমার ভাইদের কি হবে?'

'জাহান্নামে যাক বাপের সম্পত্তি আর ভায়েরা। চলো কষ্টে-সৃষ্টে নিজের ছেলেটিকে গিয়ে মানুষ করি।'

'এখন আর ছেড়ে যাওয়া চলে না জাহানারা। প্রথম দিন, যেদিন আমার শ্বশুরের ইন্তেকাল হয় আমি তোমাকে একথা বলেছিলাম। তুমি তখন আমাকে অকৃতজ্ঞ বলে খোটা দিয়েছিলে। এখন তুমি ছেড়ে দিতে বললেই ছেড়ে দিতে পারি না। বদনাম, কুৎসা আর অপবাদ শোনার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাকে থেকে যেতে হবে। পারবো না জেনেও। এটিই আমার ভাগ্য।'

'নিজের ছেলের কথা ভাববে না?'

'তার জন্য তুমি তো আছো। মাহমুদ মানুষ হবে আমি জানি। আমি দোয়াও করি'

'কিভাবে জানো?'

'যারা মানুষ হয় তাদের মুখে সেটা লেখা থাকে। মাহমুদের মুখে যে লেখা, আমি পড়তে পারি। ও তো ঠিক তোমার মত হয়েছে। তোমার মতই ওর আত্মসম্মানবোধ, তোমার মতই লজ্জা। দেখো আমাদের মাহমুদ অনেক বড় হবে। টাকা পয়সা হয়ত হবে না, তবে বিদ্বান হবে।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাই যেন করেন।'

ত্বরিৎ বিছানা থেকে উঠে জাহানারা তৈমুরকে জড়িয়ে ধরলে তৈমুর জাহানারার ললাট রেখায় সহসা একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে স্ত্রীকে গভীর স্পর্শে আদর করতে থাকল।

১০

এশার নামাযের ঘন্টাখানেক পর মাহমুদ বাড়ির উঠোনে কারো প্রবেশের আওয়াজ পেয়ে হারিকেন বাতিটা উসকে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে উঠোনে?'

'আমি মসজিদ থেকে এসেছি। আবদুল আলিম।'

খুব বিনীত সুরে আগন্তুক তার নাম বলল।

মাহমুদ বুঝল যে তালেবেএলেম ছেলেটি। মসজিদে ইমাম হুজুরের সাহায্য করার জন্য অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেয়ার জন্য যাকে রাখা হয়েছে। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মদ্রাসায় পড়ে। তার থাকার জায়গার কোনো ব্যবস্থা এখনও কেউ করে দেয়নি বলে তার আম্মা তার সাথেই একে রাখতে বলে গিয়েছিলেন।

মাহমুদ উঠে দুয়ার খুলে দিয়ে বলল, 'এসো।' ছেলেটিও গোটানো বিছানা নিয়ে, 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলে বিনীতভাবে ঘরে প্রবেশ করল। ছেলেটি মাহমুদেরই বয়েসের। লম্বা সফেদ পিরহান, মাথায় গোল টুপী। পরিধানে লুঙ্গী ও পায়ে রবারের সেন্ডেল। গায়ের রং মাহমুদের চেয়ে ঈষৎ ময়লা হলেও তাকে ফর্সাই বলা যায়। চেহারায় এক ধরনের ভয় মেশানো লাবণ্য টলটল করছে। চোখ দু'টি ছোট কিন্তু উজ্জ্বল। স্বাস্থ্য সুগঠিত। সে ঘরে ঢুকে গোটানো বিছানা বগলের নিচে নিয়ে দিশেহারা দৃষ্টিতে ঘরের আসবাবপত্র দেখছে।

'তোমার শোয়ার জন্য আমার চৌকিটা ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি এখানে শোও। আমি আব্বা-আম্মার খালি বিছানায় খাটের ওপর শোবো।

মাহমুদের কথায় আবদুল আলিম নিঃশব্দে মাহমুদের চৌকিতে বিছানা পাতল।

মাহমুদ বলল, 'মসজিদের বারান্দার পাশে তো একটা কামরা আছে। আগের মুয়াজ্জিন সেখানে থাকতেন। তোমাকে কেন সেখানে থাকতে দেয়নি?'

'আমাকে তো সেখানেই থাকতে দিয়েছিল। আমি থাকিনি।'

'কেন?'

'আমার একা থাকতে ভয় লাগে। এক রাত থেকেছিলাম। এত বড় মসজিদ,

আল্লাহ'র ঘর, সারা রাত খাঁ খাঁ করে। সে রাতে একটুও ঘুমতে পারিনি। কেবল মনে হয়েছে কারা যেন মসজিদে চলাফেরা করছে। কারা যেন নামায আদায় করছে। ভয়ে আমি সারা রাত জোরে জোরে কুরআন পড়ে সজাগ রাত কাটিয়েছি।'

কথা বলার সময় আবদুল আলিমের চোখের পাতা ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে থাকল। মাহমুদ হেসে বলল, 'তুমি বুঝি কুরআনে হাফিজ?'

'না এখনও সবটা হেফজ করতে পারিনি। তবে বছরখানেকের মধ্যেই পুরোটা মুখস্ত বলতে পারব। ক্বেরাত অত সোজা ব্যাপার নয়।'

'তুমি কার কাছে শেখো?'

'আমার ক্বারী হুজুরকে তো সবাই চেনে, ফখরে বাঙ্গাল হযরত মওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব।'

ছেলেটি বিছানায় বসল।

আবদুল আলিমের শিক্ষককে এ বাড়ির সবাই চেনে। শ্রদ্ধাও করে। মাহমুদের আব্বার তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এ বাড়িতেও বিয়েশাদী, মিলাদ-খাৎনায় মাঝে মধ্যে তিনি আসেন। তখন তার মাথায় থাকে কালো টোপর পরা এক বিশাল সবুজ পাগড়ী। তিনি মোল্লা বাড়িতে আসছেন শুনলেই বাড়িতে তমিজ রক্ষার হুড়াহুড়ি পড়ে যায়। দেয়াল থেকে ছবি, মানুষের আকৃতি আঁকা কেলেন্ডার ইত্যাদি নামিয়ে ফেলা হয়। সবচেয়ে সতর্ক থাকেন জেনানা মহল। বেপর্দা কাউকে দেখলে তিনি যদি আবার এ বাড়িতে লোক্‌মা ধরতে রাজি না হন? যেসব যুবকদের মাথায় চুল লম্বা তারা ভয়ে আড়াল খোঁজে। হুজুরের চোখে পড়লেই ডাক দিয়ে বলবেন, 'ইধর আও।'

ভয়ে ভয়ে তার নির্দেশমত কাছে গেলে বলবেন, 'কিসকা বেটা হো তুম? বাপ কা ক্যায়া নাম?'

বাপের নাম বললেই তিনি সহজে চিনে ফেলে ধমকে উঠবেন, 'ইত্‌না শরীফ আদমীকা এ্যায়সা বেলেহাজ ফরজন্দ? যাও বাল কাটকে টোপী পিনকে আও।'

এ অবস্থায় শহরের সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক-যুবতীরা তার চলাফেরার সম্ভাব্য পথকে এড়িয়েই চলে। তবে তাঁকে শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অন্তর থেকে ভালোওবাসে। তাকে না হলে এ শহরের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানই চলে না। দু'টি ঈদের নামাযে তিনিই ইমামতি করেন। তার সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তেলাওয়াত শুনতে শহরের সকলের কানই তৃষ্ণার্ত থাকে। অসুখে-বিসুখে কিংবা কোনো ধর্মীয় জলসায় যোগ দিতে তিনি দেশের বাইরে থাকলে সে বারের ঈদের জামাত যেন অপরিতৃপ্ত থেকে যায়। তাছাড়া তাঁর মত নির্লোভ, আত্মভোলা আলেম

সচরাচর দেখা যায় না।

আবদুল আলিম মওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবের শিষ্য জেনে মাহমুদও কেমন যেন একটু শ্রদ্ধামিশ্রিত বিব্রত অবস্থায় পড়ে গেল। মাহমুদের টেবিলে ছড়ানো বইপত্র দেখে আবদুল আলিম জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বুঝি ইংরেজী ইস্কুলে পড়েন?'

'হ্যাঁ, শুধু ইংরেজী স্কুলেই পড়ি না, সাহেব-মেম সাহেবদের কাছে পড়ি। তা বলে আমাকে আপনি বলতে হবে না, আমি তো তোমার সমবয়েসীই হব। আমার নাম মাহমুদ। নাম ধরে ডাকলেও চলবে।'

'আপনি কুরআন পড়েননি?'

'কেন পড়বো না? আমিও তো মোল্লা। জানো না এটা মোল্লা বাড়ি? সবাইকে খুব ছোট বয়েসেই কুরআন খতম করতে হয়, নামায পড়া শিখতে হয়। তবে তোমার মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি না।'

'আমার হুজুরের কাছে শুনেছি এ বাড়ি থেকে নাকি আগের কালে অনেক আলেম-ওলামা বেরিয়েছেন। তারা অনেকে বড় বড় কিতাব লিখে গেছেন, সে কিতাব এখনও দেওবন্দে পড়ানো হয়।'

এ বাড়ির অতীত সম্বন্ধে আবদুল আলিমের বেশ পরিষ্কার ধারণা আছে দেখে মাহমুদ খুশী হল, 'হ্যাঁ আমিও শুনেছি। তবে এখন তো আরবী ফারসীর চর্চা আমাদের বাড়িতে কেউ করেন না।' হাসল মাহমুদ, 'লেখাপড়ার দিকেও এ বাড়ির মানুষের ঝোঁক কমে গেছে। সকলেই এখন ব্যবসায়ী। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের বাড়ির কেউ সরকারী চাকুরী নেয়নি।'

'আপনি তো ইংরেজী পড়েন। আপনিও পড়া শেষ করে ব্যবসা করবেন?'

হেসে প্রশ্ন করল আবদুল আলিম।

মাহমুদও হাসল, 'না, দোকানদারি আমার ভালো লাগে না।' মাহমুদ বুঝল, আবদুল আলিম যদিও তারই বয়েসী, তবুও কথাবার্তায় এবং ছবিসুরতে তার চেয়েও ছেলেমানুষী কৌতূহলে পূর্ণ। 'আমি লেখাপড়া শিখে কি করব তা কি এখনি জানি? আমার কেবল বই পড়তে ভালো লাগে। এমন বই যাতে আমার অজানা অনেক বিষয় থাকে। আমি এমন কিছু করব যাতে আমার বইপড়া বন্ধ করতে হবে না।' মাহমুদ কথা বলতে বলতে তার বাপ-মায়ের বিছানায় গিয়ে বসল, 'এখন রাত হয়েছে অনেক, চলো শুয়ে পড়ি। আর কাল সকাল থেকে আমাকে তুমি করে বলবে।'

'আমার হঠাৎ কাউকে তুমি বলাটা আসে না যে? এক কাজ করলে হয় না?'

'সেটা আবার কি?'

'আপনি, আরে আবার আপনি বলছি, তুমি আমার দোস্ত হয়ে যাও না, তাহলে দোস্তকে তুমি বলতে আটকাবে না।'

'বেশ এখন থেকে তাই হল।'

'তাহলে বাতি নিভিয়ে এসো শুয়ে পড়ি।'

মাহমুদ বাতি নিভিয়ে বালিশে মুখ চেপে হাসতে লাগলো।

—

সকালে সুমধুর কুরআন তেলাওয়াতের শব্দে মাহমুদের ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙলেও আবদুল আলিমের ক্বেরাত শোনার জন্য সে বিছানায় চোখ বুজে পড়ে থাকল। আবদুল আলিম তখন সুরা রহমানের মাঝামাঝিতে চলে এসে মওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবের ভঙ্গীতে প্রশ্নবোধক আয়াতগুলোতে নেমে শরীর দুলিয়ে বিচিত্র সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করছে।

খুব ভালো লাগল মাহমুদের। সে বিছানায় উঠে বসে চুপ করে ক্বেরাত শুনতে লাগল। সুরা শেষ হলে হঠাৎ কোহিনুরের ডাকটা কানে বাজতেই সে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল।

'এখন আমার ছাগীটাকে মাঠে নিয়ে যেতে হবে। হাঁস-মুরগী ছাড়তে হবে।'

আবদুল আলিম বলল, 'আমারও শেষ।' কিতাব গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'তোমাকে ঘুমে রেখে আমি মসজিদে গিয়ে ফজরের আযান দিয়েছি। নামায শেষ হলে ফিরে এসে সুরা রহমান তেলাওয়াত করে তোমার ঘুম ভাঙালাম। মসজিদে বোধ হয় আমার নাস্তা এতক্ষণে দেয়া হয়েছে দোস্ত। আমি যাই, নাস্তা সেরে মাদ্রাসায় যাব।'

আবদুল আলিম বেরিয়ে গেলে মাহমুদ বাইরে এসে যথারীতি খোয়াড় খুলে দিল। তখনও কুয়াশা ছাড়েনি। বেগুন খেতের দিকে তাকিয়ে বুঝল সারা রাত ঘন কুয়াশা ছিল। বেগুন পাতাগুলো পানিতে সপ সপ করছে। টুনটুনীদের কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া না গেলেও দোয়েল আর চড়ুইয়ের ডাকে সকালের আবহাওয়াটা ভরে আছে। সিঁড়ির কাছের সবগুলো ফুলগাছে ফুল ফুটেছে। বিশেষ করে গাঁদার ঝাড় ফুলে ফুলে হলুদ। সুর্মা মরিচের গাছগুলোতে কালো মেঘের কড়ে আঙুলের মত মরিচগুলোও পুষ্ট হয়ে দুলছে। তার আব্বার প্রিয় এই মরিচ গাছগুলো। তিনিই সুর্মা মরিচ পছন্দ করেন। বেল গাছটায় অনেকগুলো কাক ডানায় মুখ গুঁজে ঝিমুচ্ছে। এখনও তাদের আহারের জন্য উড়ে যাওয়ার সময় হয়নি। কুয়াশা আর প্রচন্ড শীতে ধূর্ত পাখিগুলা জবুথবু। মাহমুদ চাদরে শীত মানবে না দেখে গরম কাপড়ের হাফপ্যান্ট, ফ্লানেলের কলাপাতা রংয়ের মোটা

শার্ট পরে তার ওপর নতুন বিলেতী ব্লেজার চাপিয়েছে। কোটটা গাঢ় নীল রংয়ের আর বোতামগুলো সোনালী রংয়ের। কলকাতা থেকে আব্বা সদ্য এনে দিয়েছেন। টাইও আছে মাহমুদের। তবে সে পরে না। যদিও স্কুলে টাই বাঁধাটাও তাদের শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। কেউই বাঁধে না। মাহমুদকে এ পোশাকে খুব মানায়। সবাই তাকিয়ে থাকে। এমনকি ফাদার জোনস্ও এ পোশাকে তাকে দেখলে প্রীত হয়ে ওঠেন। বলেন, 'মাই সান, তোমাকে তো সাহেবের বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে।'

মাহমুদ তখন শরম পেয়ে মাথা নুইয়ে ফেলে। ফাদারের কৌতূহলী চোখের দিকে তাকাতে পারে না। ইস্কুল শেষে বাড়িতে এসেই সে ব্লেজার আর ফ্লানেলের গ্রীন শার্ট খুলে আলমারীতে রেখে দিয়ে সাধারণ শার্ট প্যান্ট পরে মাঠে বেরোয়। যদিও লজ্জায় পড়েই মাহমুদ এমন করে, তবুও বিলেতী পোশাকের প্রতি তার মমতা বেড়ে যায়। সে আবিষ্কার করে বিলেতী পোশাকেই তাকে মানায় ভালো। ঐ পোশাকেই সে সমবয়েসী শুধু নয়, সবাইকেই ছাড়িয়ে যায়। রাস্তায় ঐ পোশাকে বেরুলে সবাই তার আপাদমস্তক দেখতে থাকে। পায়ে গ্লাসকীডের ইংলিশ স্যু, তাও আবার জগত-বিখ্যাত ফ্রেকস্ কোম্পানীর তৈরী। মাখন রংয়ের উলের মোজা। তার সাথে আবার বৃটিশ কিশোরদের সর্বাধুনিক পরিধেয়, যা বিলেতে এখন প্রতিটি বালকই পরছে। এ পোশাক গায়ে দিলেই মাহমুদের মনে হয় সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মত একটি মফস্বল শহরে বুঝি একটু আলাদা। একটু বেশী স্মার্ট। আর তার চেহারা, গায়ের রং, শরীরের গড়নও তার কাছে মনে হয় কেমন যেন অন্যদের চেয়ে একটু বেশী সুন্দর।

এই আধুনিক রুচি তৈরী হওয়ার ব্যাপারে তার মায়ের আগ্রহই বেশী। তার মাকেও মাহমুদ দেখেছে পটের বিবির মত সেজে থাকতে। তার আব্বা কলকাতা থেকে দোকানের জন্য মাল আনতে গেলেই তার আম্মা খৃষ্টান মিশন থেকে আনা ইংরেজী ম্যাগাজিন দেখিয়ে দেখিয়ে ছেলের জন্য আধুনিক মডেলের প্যান্ট-শার্ট আনতে বায়না ধরে। নিজেও কাননবালা স্টাইলের শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোটের অর্ডার দেন। ফলে এ শহরের সবচেয়ে আধুনিক রুচির পোশাক পরে মাহমুদের ক্ষুদ্র পরিবারটি। এতে অবশ্য বাপ-মায়ের অন্য শরীক এবং প্রতিবেশীদের ঈর্ষারও অন্ত নেই। তারা একটু সুযোগ পেলেই টিপ্পনী কাটে। আবার নিজেরা যখন কোথাও বিয়েশাদীতে বেড়াতে যায়, তখন আসে মাহমুদের মায়ের শাড়ী ব্লাউজ প্রসাধনী ইত্যাদি ধার নিতে।

আজ সকালে উঠোনে হাঁস-মুরগী ছাড়তে নেমেই মাহমুদ টের পেয়েছে শীতটা প্রচন্ড। খোয়াড় খুলে দিয়েই সে ঘরের ভেতরে এসে তার গরম কাপড়গুলো পরে নিয়েছে। জুতো-মোজাও পরেছে। কারণ এখন এই কুয়াশার

মধ্যেই তাকে বেরুতে হবে কোহিনুরকে মাঠে রেখে আসার জন্য। তারপর মামা বাড়ি গিয়ে নাস্তা খেতে হবে। কি একটা খৃষ্টান পরবের জন্য আজ স্কুলও বন্ধ।

মাহমুদ কোহিনুরকে নিয়ে রাস্তায় বেরুতেই দেখল উত্তর দিক থেকে কুয়াশা ভেদ করে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি তার দিকে হাত তুলে এগিয়ে আসছে। হাঁটা দেখেই মাহমুদ চিনতে পারে মারিয়া আসছে। সহসা তার মনে হল মারিয়া মেয়েটা একটু ঝগড়াটে হলেও তেমন খারাপ নয়। শাদা চামড়া বলে একটা আহত দম্ভ থাকলেও সে মাহমুদকে অপছন্দ করে না। তাছাড়া আম্মাও বলেন, মেয়েটা দুঃখী, এতীম। এতীমদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে নেই।

এখন এই সাত সকালে আধো-আলো আধো কুয়াশার মধ্যে মারিয়াকে মর্নিং ওয়াক করতে দেখে মাহমুদের ভালোই লাগল। আর মারিয়া যে সেদিনের সেই অপমানজনক কথাবার্তার পরও ফাদারের কাছে নালিশ করেনি এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকাও তার উচিত মনে হল। মারিয়া কাছে এসে দাঁড়াতেই মাহমুদ অত্যন্ত সম্ভ্রমভরে তাকে সম্বোধন করল, 'এই যে মিস্ কুকার, কেমন আছো? তোমাকে তো কাশ্মীরী শালে দারুণ মানিয়েছে, কোথায় পেলে?'

'ফাদার বড় দিনে প্রেজেন্ট করেছিলেন।'

'দারুণ।'

'তোমার ভালো লেগেছে?'

'খুব।'

'তাহলে আগামী বড় দিনে আমি একটা শাড়ী পরব। তোমার মাদার আমাকে শাড়ী পরা শিখিয়ে দেবেন বলেছেন।'

হাসল মারিয়া। মুখখানি শীতের দাপটে শুকনো হলেও তার হাসিটা সরল। মাহমুদ দেখল যে গায়ে কাশ্মীরী শাল থাকলেও মারিয়া শীতে ঠির ঠির করে কাঁপছে। তার ঠোঁট ফেটে রক্তবর্ণ হয়ে আছে। গাল আর নাকের ডগাও লাল। নাকে সর্দি থাকায় একটা রুমালে বার বার নাক আর চোখ মুছছে।

মাহমুদ বলল, 'তোমার তো সর্দি লেগেছে বলে বোধ হচ্ছে। এত সকালে ভর কুয়াশার মধ্যে কেন বেরিয়েছ?'

'ও কিছু নয়। কোহিনুরকে ব্রেকফাস্টে নিয়ে যাচ্ছ বুঝি?'

মারিয়া আবার হাসার চেষ্টা করতে গিয়ে ফাটা ঠোঁটের কারণে সুন্দর করে হাসতে পারল না। হাতের রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে শীতে কাঁপতে লাগল। মাহমুদ দেখল, মারিয়ার পায়ে সাধারণ এক জোড়া কম দামের চটি। সাধারণত সায়েবরা এ ধরনের চটি পরে না। এ চটিতে শীত ঠেকানো অসম্ভব। সহসা মাহমুদের মনে পড়ল মেয়েটি গরীব। সায়েবের বাচ্চা হলে কি হবে, মিশনে সে অরফেন। তার

মা তাকে বলেছিল মারিয়া মেয়েটির বাপ-মা কেউ নেই বলেই মেয়েটা মিশনে আশ্রিতা। তাকে প্রকৃতপক্ষে দেখার কেউ নেই। মিশনের এ দেশীয় খৃষ্টানরাও তাকে তেমন পাত্তা দেয় না। আর সায়েবসুবো যারা মিশনে পরিবার নিয়ে আছে তারাও সম্ভবত মারিয়ার সাথে ভালো ব্যবহার করে না কিংবা ডেকে একটু আদর করে না। যদিও সারা দিন ঐসব সায়েব-মেমরা খৃষ্টীয় সেবা ও দয়ার কথা বলে। কেবল ফাদার জোনস্‌ই মারিয়া কুকারকে একটু আদর করেন। ফাদারই শিশু অবস্থায় মারিয়াকে মিশনে নিয়ে আসেন এবং এক বাঙালি খৃষ্টান ধাত্রীর কাছে রেখে লালন-পালন করান। বহুদিন আগে মারিয়ার সেই ধাত্রী মাতাও মারা গেলে মারিয়া একা একাই মিশনের হোস্টেলে থেকে এতটুকু বড় হয়েছে। মারিয়া অবশ্য খুব ভালো ছাত্রী। ক্লাসে ঘোষপাড়ার কংকা আর মাহমুদ প্লেস নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মারিয়া কুকার তৃতীয় স্থান স্থায়ীভাবে দখলে রেখেছে। যে কোনো সময় ওপরেও উঠে আসতে পারে। কেবল সে একটু সেবাযত্ন আর পড়াশোনার অবকাশ পেলেই এদের একজনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজে ওপরে উঠে আসবে। একথা কংকা এবং মাহমুদ ঠিকই জানে এবং ভয়ে ভয়ে থাকে।

এখন স্যান্ডেল পরা অবস্থায় মারিয়াকে কাঁপতে দেখে মাহমুদ বলল, 'মিস কুকার, আমার সাথে চলো কোহিনুরকে মাঠে রেখে আসি।'

'ব্রেকফাস্টের জন্য?'

এবার খিল খিল করে হেসে ফেলল মারিয়া। যদিও ঠোঁটে রুমাল চাপা থাকায় পুলকের আওয়াজটা তেমন ফুটল না।

মাহমুদও হাসল, 'আমাদের কোহিনুর ব্রেকফাস্টের ধার ধারে না। সকালে যে খাওয়া শুরু করে তা সন্ধ্যেয় শেষ করে আর সারা রাত মনের সুখে জাবর কাটে। বরং আজ তোমাকে আমি ব্রেকফাস্ট খাওয়াব। যাবে আমার মামু বাড়ি? সেখানে আমার মা আছেন। গেলে তার সাথে দেখা হবে। যাবে মিস কুকার?'

'আমাকে ওভাবে মিস কুকার, মিস কুকার বলে ডাকবে না। মারিয়া বলবে। ওভাবে বড়োরা ফর্মালিটি করে। তুমি আমার ফ্রেন্ড।' মারিয়া চাদর সামলে মাথা ঢাকল, 'হ্যাঁ যাবো। ওখানে আন্টির হাতে ব্রেকফাস্ট খাবো।'

'তাহলে এসো আগে কোহিনুরকে ঘাসের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে আসি।'

'বাহ খুব সুন্দর কথা। ঘাসের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে আসি। বাংলায় খুব সুন্দর কথা তুমি বল। তুমি একদিন লংফেলোর মত কবি হয়ে যাবে না তো আবার? বাহ, ঘাসের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে আসি।'

মারিয়ার কথায় মাহমুদও চমকে গেল, 'আমি কবি হব? কি যে তুমি বলো

না মারিয়া! ওভাবে তো আমি সব সময়ই কথা বলি!'

- হ্যাঁ, তোমার কথা শুনতে সব সময় আমি ভালোবাসি, কান পেতে রাখি। তুমি অন্য রকম বাংলা বল। কেউ তোমার মত বলে না। এ জন্যই তো তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করি না। তোমার কাছ থেকে ভালো কথা, খারাপ কথা সব আমি শিখি।'

মাহমুদ অবাক হয়ে গেল, 'এ জন্যই বুঝি তুমি সেদিনের সেই ঝগড়ার কথা ফাদারকে বলোনি?'

'না।'

'তুমি খুব ভালো মেয়ে মারিয়া। সেদিনের ঝগড়ার জন্য আমাকে মাফ করে দাও।'

'মাফ করব না। আমি তোমার গালাগালির ভাষা শিখব। ভালো ভাষা শিখব। তারপর ইচ্ছে হলে মাফ করে দেব।

১১

কোহিনুরকে ঘাসের বনে রেখে মারিয়াকে নিয়ে মাহমুদ তার মামুবাড়ির বারান্দায় এসে উঠল। সামনের সবগুলো কোঠার দুয়ারই বন্ধ। এখন আর এদিকে কুয়াশা নেই। আরামদায়ক রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। মামুবাড়ির সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। মাঠে শীতের ধান ক্ষেতে পাকা ধানের ঢেউ। জোর বাতাস আসছে ধান ক্ষেত পেরিয়ে আর বাড়িটার প্রতিটি বন্ধ দরজা-জানালায় হাওয়ার ধাক্কা লেগে খট খট শব্দ উঠছে। দালানের পূবদিকে বিশাল পুকুর। পুকুরপাড়ে সারি করে লাগান কাঁঠাল গাছের মাথায় বাতাসের দাপানি। বারবাড়ির দালানেও কারো সাড়া শব্দ নেই। বারবাড়ির বারান্দাটাও ফাঁকা। দুয়ারগুলো ভেতর থেকে বন্ধ।

মাহমুদ বড় দালানের বারান্দায় পেতে রাখা লম্বা টুল দেখিয়ে মারিয়াকে বলল, 'এখানে বস। আমি আম্মাকে ডেকে তুলি।'

তার গলার আওয়াজেই সম্ভবত মাঝের কোঠার দুয়ার খোলার শব্দ হল। বারান্দায় এসে মাহমুদের আনু খালা হাই তুলে জিজ্ঞেস করল, 'তোর সাথে এই সাতসকালে ওটি আবার কে রে?'

মাহমুদ বলল, 'এই যে খালা, এ আমার সাথে পড়ে, মিস মারিয়া কুকার।

আমাদের মিশনেরই মেয়ে। আম্মার সাথে দেখা করতে এসেছে। আম্মা এখনো জাগেনি?'

'তোর আম্মা রান্নাঘরে। সেখানে গেলে সোজা আমার কামরার ভেতর দিয়ে চলে যা।' আবার হাই তুলল আনু খালা। ততক্ষণে মারিয়া তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে 'গুড মর্নিং' বলতেই খালা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওমা' এতো দেখি মেমের বাচ্চা? ওরে মাহমুদ, ওকে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলি?'

'বললাম তো ও আমার ক্লাসের বন্ধু। ফাদার জোনস্ এর অভিভাবক। আম্মাও খুব পছন্দ করেন। প্রায়ই তো আমাদের ওবাড়িতে আসে। আজ আমি ওকে আমার সাথে নাস্তা খাওয়ার দাওয়াত করেছি।

আনু খালা খুশী হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? তবে তো মেহমানকে খুব যত্ন করতে হয়। যা, তোদের ঘরে নিয়ে বসতে দে। রান্নাঘরে বোধহয় তোর আম্মা দুলাভাইকে খেতে দিয়েছে। যা, আমিও হাত-মুখ ধুয়ে এক্ষুণি আসছি। তোর মেহমানের সাথেই খাব।'

'তাহলে আমরা বরং রান্নাঘরেই গিয়ে বসি খালা।'

'সে কি রে, ইংরেজের মেয়েকে আমাদের হেঁসেলে নিয়ে খেতে দিবি?'

'তাতে কি, ও তো কতবার আমাদের বাড়ির হেঁসেলে বসে আম্মার বেড়ে দেয়া ডাল-ভাত খেয়েছে।'

এ কথায় মারিয়াও হেসে ফেলল, 'আপনি আন্টির বোন? আমি তো আন্টির কিচেনে গিয়ে যখন যা থাকে তাই খেয়ে নিই। আমি ইংরেজ না। আমার শরমও নেই। আমার দেশ নিউজিল্যান্ড। আমার বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। মিশনে আমি অরফেন। আশ্রিত।'

মারিয়ার মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে আনু থ হয়ে চেয়ে থাকল। মিশনের সায়েবসুবোর বাচ্চারা এমন স্পষ্ট উচ্চারণে বাংলা কথা বলতে পারে না। আনুও এক সময় ঐ খৃস্টান মিশন ইস্কুলেই পড়ত। সে অবশ্য বহু কাল আগের কথা। হঠাৎ তার বিয়ের আগের কিশোরী জীবনের কথা মনে পড়ে গেলে সে মারিয়ার দিকে স্নেহ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এসো আমিই তোমাদের নিয়ে রান্নাঘরে যাই।'

আনু খালার পিছে পিছে মাহমুদ ও মারিয়া নানাবাড়ির বিশাল রান্নাঘরে এসে ঢুকল। একটু আগে মাহমুদের আব্বাকে জাহানারা নাস্তা খাইয়ে বাজারে বিদেয় করে নিজে এক কাপ চা নিয়ে বসেছে মাত্র। এর মধ্যে আনুর সাথে মাহমুদ ও মারিয়াকে ঢুকতে দেখে জাহানারা অবাক হল, 'এমন ফজরের অক্তে মারিয়া কোত্থেকে এলি রে?'

'মর্নিং ওয়াকে এসেছিলাম আন্টি। এখন খিদে পেয়েছে। খেতে দিন।'

চাঁচাছোলা কথা মারিয়ার। যেন সে এ পরিবারের কত দিনের আত্মীয়! জাহানারা হেসে ফেলল, 'ডিমের পোচ খাবি না পেঁয়াজ কেটে ভেজে দেব? সাথে চালের রুটি দিচ্ছি।'

'তাই দিন। তবে ডিমটা ভেজে। পোচটোচ আমি খাই না আন্টি, বমি পায়।'

'ওমা, এ তো দেখি বাঙালির মত রুচি!'

আনুও হাসল।

রান্নাঘরে শীতের দাপট একটু কম। বিশাল চুলোয় ধা ধা শব্দে কাঠের লাকড়ি জ্বলছে। ঘরের ভেতরে বাতাসটাও তাতানো বলে মারিয়ার গতর থেকে শীতের কামড় মুহূর্তে উবে যাওয়াতে সে চাদর খুলে মোড়ায় মাহমুদের পাশে বসে পড়ল।

জাহানারা চালের গরম রুটির ওপর ভাজা ডিম বিছিয়ে প্লেট তুলে দিল মারিয়ার হাতে আগে। মাহমুদ শাদা রুটিই মায়ের সামনে থেকে তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলে মারিয়া বলল, 'আমার পাত থেকে হাফ ওমলেট নাও। তোমার জন্য হয়ে গেলে আমার হাফ আমাকে ফেরত দিতে হবে, মনে থাকে যেন।'

মারিযার কথায় সবাই হাসল। জাহানারা বলল, 'ডিম তো ঝুড়িতে কাড়ি কাড়ি আছে। দু'জনে মিলে পেট ভরে খা। আমি আরও ডিম ভেজে দেব। ওরে মেয়ে, তোর ইচ্ছে হলে বাসি তরকারী দিয়েও খেতে পারিস। মাছের বাসি তরকারী আছে রুই মাছ দিয়ে রাঁধা, খাবি?'

মারিয়া কিছু বলার আগেই মাহমুদ বলল, 'বা রে, আমাকে দিন না, আমি খাব। তাহলে আর ওমলেট কেন?'

এ কথায় মারিয়াও লাফিয়ে উঠল, 'দিন আন্টি, আমি গেস্ট, আমাকে আগে দিতে হবে।'

মারিয়ার হা-ভাতে আগ্রহে জাহানারা খুশী। জাহানারা একটা প্লেট হাতে রান্নাঘরের বিশাল আলমারীর দিকে এগিয়ে গেল, 'দাঁড়া দু'জনকেই দিচ্ছি। একটু সবুর মেনে বোস। আমি বাসি সালুনটা আগে একটু গরম করে নিই।'

এ সময় ঘরে এসে ঢুকল সারোয়ার। মাথার চুল উস্কুখুস্কু। পরনের পায়জামা ও শার্ট কুঁচকে আছে। দেখলেই মনে হয় চেহারাটা একটু অস্বাভাবিক, চোখ লাল। সারোয়ার ঘরে ঢুকেই জাহানারাকে বলল, 'কিছু খেতে দাও তো বুবু।'

'তার আগে বল রাতে কোথায় ছিলি।'

জাহানারা হাতের খুন্তিটা তাওয়ার অন্য পাশে রেখে পূর্ণ দৃষ্টিতে ভাইয়ের

দিকে তাকাল, 'তোর সম্বন্ধে যা শুনতে পাচ্ছি তাতে তো তোর পাতে খাবার দিতে ইচ্ছে হয় না।'

'আমার সম্বন্ধে কার কাছে শুনলে? তোমার বর তৈমুর মিয়ার কাছে? তার সম্বন্ধেও তো মানুষ নানা কথা বলছে? কই, তার খাওয়া পরা তো এ বাড়িতে কেউ বন্ধ করেনি! ঠিক আছে, তোমার হাতে আমি আজ থেকে আর খাব না।'

বলেই সারোয়ার যেভাবে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

জাহানারা স্তম্ভিত হয়ে আনোয়ারার দিকে তাকাল। আনুও মনে হল সারোয়ারের এ ধরনের আচরণের অর্থ খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা। আনু অবাক হয়ে বলল, 'কি হল বুবু? সারোয়ার তোমার সাথে এ ধরনের বেয়াদপী করল কেন? আর তুমি যে বললে, রাতে ও কোথায় ছিল?'

জাহানারা বোনের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কতক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে সারোয়ারের যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকল। সারোয়ার তখন উঠোন পেরিয়ে আনুর কামরায় গিয়ে ঢুকছে। সারোয়ারকে নিজের কামরায় ঢুকতে দেখে আনু বলল, 'যাই, দেখি সারোয়ারটা তোমার সাথে হঠাৎ আজ এমন করল কেন?'

'শোন আনু, দাঁড়া।'

'ও ঘরে আমজাদ জেগেছে না?'

'তোমাদের জামাই তো খুব ভোরেই জেগেছে। এতক্ষণ বড় আম্মার সাথে তার ঘরে বসে আলাপ করছিল। এতক্ষণে বোধহয় কামরায় ফিরে চা-নাস্তার জন্য হাপিত্যেশ করছে।'

'তাহলে তুই যা, আমি মাহমুদ আর মারিয়াকে বিদেয় করে এক্ষুণি জামাইয়ের জন্য চা নাস্তা পাঠাচ্ছি। আর শোন, আমজাদের সামনে সারোয়ারকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবি না।'

'ঠিক আছে, করব না। কিন্তু বুবু, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি যে বললে সারোয়ার রাতে বাড়িতে ছিল না, তাহলে সে কোথায় ছিল?'

আনোয়ারা যেতে উদ্যত হয়েও দরজার কাছ থেকে চুলোর ওপর ঝুঁকে থাকা জাহানারার দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

জাহানারা একবার মারিয়া ও মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বোনের মুখের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে খুব আস্তে করে বলল, 'ওর কথা তোর দুলাভাইয়ের কাছে যা শুনলাম, এখন ওর এই আচরণে মনে হচ্ছে সবি ঠিক।'

'দুলাভাই কি বলেছে?'

'সারোয়ার খারাপ হয়ে যাচ্ছে আনু।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ বোন, সারোয়ার গত রাতে বাড়ি ছিল না।'

'কোথায় ছিল তাহলে?'

'বাজারে।'

'বাজারে কোথায়, আমাদের দোকানে?'

'বাজারের খারাপ পাড়ায়।'

'বলো কি বুবু?'

'তোর দুলাভাইয়ের কানে কে যেন নালিশ করেছে। এখন দেখলি বিষয়টি মিথ্যে নয়।'

বলেই জাহানারা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলে আনু ধপ করে একটা মোড়ার ওপর বসে পড়ল। মারিয়া ও মাহমুদ কি বলবে বুঝতে না পেরে আনুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে আনু বলল, 'মাহমুদ, তুই ওকে নিয়ে তোদের বাড়িতে চলে যা। একটু পরে আমি কাউকে দিয়ে ও বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দেব।'

মারিয়া আর মাহমুদ হাতের প্লেট মেঝেয় রেখে বেরিয়ে গেল।

মারিয়া বলল, 'বাজারের খারাপ পাড়াটা কোথায়?'

মামুবাড়ি থেকে মাহমুদ মারিয়াকে নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে এসে খাটের ওপর বসে দু'জন গল্প করছিল। মারিয়া অবশ্য ফেরার সময় তার হোস্টেলে ফিরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মাহমুদ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছে। মামু সারোয়ারের ঘটনায় মাহমুদের মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। ও বাড়িতে যে মামুটিকে তার একটু পছন্দ, সে এই সারোয়ার। মাহমুদের চেয়ে সাত বছরের বড়। সারোয়ারও মাহমুদকে খুব পছন্দ করে। মাহমুদকে ম্যাটেনি শো'র টিকেট, গল্প-উপন্যাস আর মাঝে-মধ্যে এটা-ওটা উপহার দেয়। তাছাড়া টাউন হলের পাশে যখন মাছ ধরার প্রতিযোগিতা হয় তখন সারোয়ার কোত্থেকে যেন পান কিনে এনে মাহমুদকে দেয়। সবাই জানে মাহমুদের মাছ ধরার সখ। তার এক জোড়া হুইলের ছিপও আছে। এই ছিপগুলো সারোয়ারই জোগাড় করে দিয়েছে।

মারিয়ার কথায় মাহমুদ মুখ তুলে তাকাল, 'ওসব তুমি বুঝবে না মারিয়া।'

'কেন বুঝবো না? আমি তো বাংলা বুঝতে পারি! না বুঝলে ইংরেজীতে বল, আমি বুঝতে পারব।'

'বাজারে খারাপ মেয়েরা যেখানে থাকে সেটাকে বলে খারাপ পাড়া। আমার সারোয়ার মামু সেখানে যেতে শুরু করেছে।'

'প্রস্টিটিউট?'

মারিয়ার প্রশ্নে মাহমুদ মুখ নামিয়ে ফেলল। কোন জবাব দিল না।

মারিয়া বলল, 'ও মাই গড! ভেরী ব্যাড। তোমার মামুকে যীশু ক্ষমা করুন। তোমার মামু কি ওখানে কাউকে ভালোবাসে?'

চোখ বড় বড় করে মারিয়া তার কৌতূহল প্রকাশ করছে। যেন নেটিভদের সমাজ সম্বন্ধে তার অপার কৌতূহলে তরঙ্গ উঠেছে।

'আমি জানি না মারিয়া।'

'তোমার মামুকে তোমার আম্মা খুব ভালোবাসেন?'

'আমরা সবাই খুব ভালোবাসি সারোয়ার মামুকে।'

'তাহ্‌লে তাকে আন্টি খারাপ বলছেন কেন?'

'তিনি খারাপ পাড়ায় গিয়ে যদি খারাপ হয়ে যান এই ভয়ে।'

'তিনি যদি সেখানে কাউকে ভালোবাসেন তবে কেন সেখানে যাবেন না? ভালোবাসলে যেতে হয় না বুঝি!'

'তুমি আমাদের সমাজের ভালোমন্দ কিছু বোঝো না মারিয়া। সারোয়ার মামুর মত সুন্দর মানুষ খারাপ মেয়েদের কাউকে কেন ভালোবাসবেন? তিনি হলেন এ শহরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের ছেলে।'

মাহমুদের কথায় মারিয়া একেবারে চুপ মেরে গেল। মনে হল, সারোয়ার মামুর খারাপ পাড়ায় যাওয়াটাকে সে পছন্দ না করলেও ভালোবাসলে যে কেউ যেখানে খুশী যেতে পারে তার এই বিশ্বাস। তবে মাহমুদদের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে যে একটা দুর্ভাবনার সূচনা হয়েছে তা মারিয়া বিদেশী হলেও যেন বুঝতে পেরেছে।

এ সময় মামু বাড়ি থেকে নাস্তার প্লেট মাটির সরা দিয়ে ঢেকে নিয়ে একটা কাজের মেয়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'নাস্তা নিয়ে এলাম। খেয়ে সারলে প্লেট নিয়ে যাব।'

মহমুদ সরা উদোম করতেই মারিয়া ডিমের ওমলেট ও চালের গরম রুটি সমানে মুখে পুরতে লাগল। মাহমুদও হাত বাড়িয়ে একটা চালের রুটি আর ওমলেটের দিকে মারিয়ার আগ্রহ দেখে মাহমুদ ভাবল, সত্যি, মারিয়াটাকে সম্ভবত মিশনে ঠিকমত কেউ খেতে দেয় না।

মাহমুদ রুটির টুকরোটা হাতে রেখেই বলল, 'তুমি সবটাই খেয়ে নাও মিস কুকার। আমি আর খাব না।'

ততক্ষণে ও বাড়ির কাজের মেয়েটা নিজেই এ বাড়ির চুলোয় শোলার আগুনে চা করে দু'জনের সামনে রাখল।

১২

সন্ধ্যার একটু পরেই অন্যান্য মফস্বল শহরের মত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরটাও জনশূন্য হয়ে পড়ে। এ শহরকে যারা সারাদিন প্রাণচঞ্চল রাখে তারা সবাই আশেপাশের গাঁয়ের লোক। মৌড়াইল, শিমরাইলকান্তি, কাউতলা, ভাদুগড়, রামরাইল থেকে শুরু করে আবলুস-বিরামপুর পর্যন্ত শহরের সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণ দিকের জনবসতিগুলো ছড়িয়ে আছে। অন্যদিকে পুনিয়ট, পৈরতলা ইত্যাদি শহর-সংলগ্ন জনবসতিগুলোও মূলত গ্রামই। আর উত্তরদিকে সুহিলপুর পর্যন্ত সবগুলো গ্রাম জনপদ নিয়েই ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর। শহরের চারদিকে তিতাস নদী শহরটাকে বাসুকী সাপিনীর মত প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে। আর নৌ চলাচলের সুবিধার জন্য কেউ হয়ত কোনোকালে একটা অপ্রশস্ত খাল কেটে শহরটিকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। ধান, চাল আর মরিচ-মশলার নাও নিয়ে আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা অতি সহজেই শহরের ভেতর ঢুকে যায়। নাও এসে লগি বাঁধে একেবারে শহরের হৃদয়-মধ্যে। থানার সামনে খালের দীর্ঘতটরেখা শান বাঁধানো হওয়ায় জায়গাটায় নাও ভিড়ানো যেমন সুবিধা, তেমনি পরবর্তী খেপের জন্য অথবা গাঁয়ের যাত্রী-নারীদের এখান থেকেই নৌকায় উঠতে সুবিধে। খালের উপর পাড় থেকেই শুরু হয়েছে হাটবাজার, এলাকা। জগতবাজার, টানবাজার, ছাতিপট্টি, সড়কবাজার, গরুর হাট ইত্যাদি। প্রায় সবগুলো হাটেই বাদশা মোল্লার কোনো না কোনো দোকান বা কারবারের কেন্দ্র আছে। মোল্লা সাহেবের ইন্তেকালের পর তৈমুর এখনও সবগুলো ব্যবসা গোছাতে পারেনি। তবে দু'একটা গুটিয়ে ফেলেছে। বৃহস্পতিবারের হাটে দালালী করার জন্য গরুর হাটের পাশে মোল্লা সাহেবের একটা গদি ছিল। এখন উপযুক্ত লোকের অভাবে তৈমুর গদিটা তুলে দিয়ে দোকানটা একজন বাঁশবেতের হিন্দু আড়তদারের কাছে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কথাবার্তা পাকা করে ঘর খালি করে দিয়েছে তৈমুর। কিন্তু কথানুযায়ী এখনও এক বছরের অগ্রিম গ্রহণ করেনি। আড়তদার সাহাবাবুর সাথে কথা হয়েছে যখনি তৈমুর লোক পাঠাবে তখনই হিসেব করে এক বছরের ভাড়া আড়তদার পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু আজ হাট ভেঙে যাওয়ার পরও তৈমুরের কাছ থেকে আড়তদারের কাছে কেউ ভাড়ার টাকার জন্য আসেনি।

ভাঙা হাটের চারপাশের অলিগলিতে অন্ধকার নেমে এসেছে। মিউনিসি-

প্যালিটির ল্যাম্পপোস্টের মাথায় কেরোসিনের বাতি একটু আগে বাতিওয়ালারা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেও এতে অন্ধকার দূর হওয়া দূরে থাক, এ আলোয় হাত মেললে হাতের পাঁচটা আঙুলও ঠিকমত পরখ করা যায় না। আড়তদার সাহাবাবুদের দোকানের উল্টোদিকের মাথায় একটা চায়ের দোকানের সামনে তখন গলির কয়েকটা মেয়ে এসে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে। সবাই দোকানের সামনে এসে চা-সিগ্রেট আর পান হাতে নিয়ে গলির মুখে পেতে রাখা একটা লম্বা টুলের ওপর বসে হাসাহাসি করতে লাগল। অর্থহীন হাসি। মেয়েগুলোর সাজ দেখলেই বোঝা যায় এরা গাঁয়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং হাটের দালালদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। গলিটা আসলে জগতবাজার থেকে সড়কবজারে যাওয়ার একটা সংযোগ পথ। পথের দু'পাশে বাজারে মেয়েদের বস্তি। একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে বস্তির প্রতিটি ছাপড়ার দরজায় একটি করে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখে উৎকটভাবে পাউডার মাখা। ঠোঁটে আলতার লাল রং ছাপিয়ে পানের খয়েরভরা কালচে রস বেরিয়ে এসেছে। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই এক ধরনের প্রদর্শন ভঙ্গী। বস্তির ভেতর থেকে ভাঙা গলায় কারো গান গাওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তবে গানের কলির চেয়ে হারমোনিয়ামের শব্দটিই পথচারীদের কানে আগে এসে লাগে। মাঝেমধ্যে ঘুংঘুরের শব্দও বাজছে। এমন কেউ কেউ নিশ্চয়ই এখানে আছে যারা নাচগানও জানে।

গলির ভেতরকার প্রথম বস্তিটির দোরগোড়ায় একটি একুশ বাইশ বছরের মেয়ে এসে লাইট পোস্টের নীচে দাঁড়াল। আশপাশের মেয়েদের মত তারও সাজগোজ হলেও দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে কেমন যেন একটু স্বাতন্ত্র আছে। সে অন্যান্য মেয়েদের মত অর্ধ উলঙ্গ নয়। তার শাড়ী পরাটা দেখতে গৃহস্থ বাড়ির বউদের মত। সারা গায়ে সোনার গয়না। দেখলেই মনে হয় সে এখানে একটু আলাদা, একটু অভিজাত। অন্য মেয়েদের চেয়ে ল্যাম্প পোস্টের আলোয় তাকে একটু দীর্ঘাঙ্গী বলে ধারণা হয়। পিঠে এক দীর্ঘ বেণী ঝুলছে। পরনে একটা লালপাড়ের গাঢ় হলুদ রংয়ের শাড়ী। গায়ে লাল ব্লাউজ। গায়ের রং যে ফর্সা তা ল্যাম্পপোস্টের আধো আলো আধো অন্ধকারেও বোঝা যায়। মেয়েটি এসে দাঁড়াতেই অন্যান্য দুয়ার থেকে এক ধরনের মুখচাপা হাসির শব্দ উঠল। পাশের দরজার সামনে বসা একটি মেয়ে তার মোড়াটার সাথে আরো একটি মোড়া তুলে এনে হলুদ শাড়ীওয়ালীর সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'নে বোস গোলাপী বু। এতক্ষণে এসে দাঁড়ালি?'

'সারাদিন ঘুমিয়ে গা ঘিন ঘিন করছিল। রাঁধা শেষ করে নেমে এলাম।'

মোড়াটায় বসতে বসতে জবাব দিল গোলাপী। সে আঁচল ঘুরিয়ে মাথার ওপর তুলল।

'তোর কি, তোর তো আজকাল আমাদের মত দুয়ার ধরে দাঁড়াতে হয় না। বাঁধা নতুন মানুষ জুটেছে। শুনেছি তোর ঐ ছোকড়াটার বাপ নাকি বামুনবেড়িয়ার অর্ধেক দোকানপাটের মালিক ছিল। অমন বাঁধা মানুষ পেলে আমাদের মত তোর আর গতর দেখিয়ে হররোজ দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? ছোকড়াটা নাকি তোকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়? কাল মাতাল হয়ে নাকি এসব কথা মাধুরীকে বলছিল। সত্যি নাকি রে গোলাপী বু?'

মেয়েটা গোলাপীর পাশে মোড়া রেখে বসল। তার চোখে কৌতূহল চকচক করছে। মনে হয় একটু ঈর্ষাও জ্বল জ্বল করে উঠল চেহারায়।

গোলাপী এসব কথার কোনো জবাব দিল না। সে গলিটার প্রবেশ-পথের দিকে চেয়ে থাকল। এ সময় আরও দু'একটি মেয়ে যার যার আসন হাতে করে গোলাপীকে ঘিরে বসল। এতক্ষণ এরাই খদ্দের ধরার জন্য গলিটার মাথায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে সমানে পান চিবুচ্ছিল আর এদিক-সেদিক পিক ফেলছিল। এদের একজন একেবারে গোলাপীর গা ঘেঁষে বসেছে। সে মনে হয় এই মেয়েদের মধ্যে অন্যদের চেয়ে একটু বয়েসে বড়। এতক্ষণ গোলাপীর সাথে যে মেয়েটি কথা বলছিল তার নাম জ্যোসনা। জ্যোসনা গোলাপীকে মুহূর্ত আগে যেসব প্রশ্ন করছিল গোলাপীর গা ঘেঁষে বসা মেয়েটি সম্ভবত এর কিছুটা শুনেছে। সে পান চিবুতে চিবুতে নিজেই শুরু করল, 'কত লোকেই বিয়ের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যায়। আবার বছর পেরুবার আগেই ফেরত আসতেও দেখি। এবার গোলাপীর পালা। গোলাপীর অবশ্য ফিরে আসতে একটু বেশী সময় লাগতে পারে। কারণ বাবুটির কেবল গোঁফদাড়ি উঠেছে। আমাদের গোলাপী বিবির ওপর টানটা একটু বেশী।' মেয়েটি পিক ফেলে ফিক করে হাসল, 'এ জন্যই গোলাপজানের কাছে একটু বসলাম, কে জানে কবে আবার দেখা হয়?'

এবারও গোলাপীর মুখ থেকে কোনো কথা বেরুল না।

জ্যোসনাও এবার একটু খোঁচা দিল, 'বড় মানুষের বাড়ির বউ হবে বলে গোলাপী বু'র গোমর বেড়েছে, আমাদের সাথে মুখ খুলতেই চায় না।'

এবার গোলাপী আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারল না, 'তোরা বড় বেশী বকবক করিস জোছনি, আমি মরি আমার নিজের জ্বালায়। আর তোরা যা হবার নয় তা নিয়ে আমাকে খুঁচিয়ে মারছিস। ভেবেছিস একটা পাগলের কথায় আমি পাড়া ছেড়ে চলে যাব? কেন যে লোকটা আমার পেছনে লেগেছে! লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দিলেও আবার আসে। এখন আমি যে কি করি? মনে হয়

এখানকার ভাত উঠেছে। অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।'

'সে কি, এ পাড়া ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি?'

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল জ্যোসনা। সবাই উবুড় হয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত গোলাপীর দিকে তাকাল।

গোলাপী বারবণিতা হলেও সমাজের মনোভাব থেকে গাফেল নয়। সে জানে তার এই নবাগত খদ্দেরটি তার জন্য অযাচিত বিপদ ডেকে আনছে। প্রতিদিনই ভাবে, সারোয়ারকে আর তার ঘরে বসাবে না। কিন্তু সারোয়ার এসে সামনে দাঁড়ালেই তার চোখের দিকে তাকিয়ে গোলাপী আর কথা বলতে পারে না। কি যেন একটা আছে ঐ ছোকরাটার চোখের মধ্যে যা অন্য দশজন খদ্দেরের মধ্যে গোলাপীর মত দেহপশারিণীও কোনোদিন খুঁজে পায়নি। আগে সারোয়ার ঘরে এলেই গোলাপী টাকা চাইত। সারোয়ারও চাওয়ামাত্রই পকেট থেকে বেহিসাব টাকা দিত। এখন আর গোলাপী টাকার কথা না তুললেও সারোয়ার নিজেই গোলাপীর হাতে টাকা তুলে দেয়। কোনো কোনো দিন বলে, 'এই নাও, আজ ভালো করে বাজার আনিয়ে রাঁধো। রাতে এখানেই খাবো।' গোলাপী অবাক হয়ে ছোকরাটির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'রাঁধবো মানে, আমার হাতে খাবে?'

'কেন, তুমি কি কামরাঙা মরিচ বেটে রাঁধো নাকি যে খাওয়া যাবে না? আমি রাতে এখানে খাবো এবং এখানেই আজ রাতটা থাকব। কোনো নিষেধ আছে নাকি? কই জানিনা তো!'

বলেই সারোয়ার বেরিয়ে যায়। অবাক বিস্ময়ে গোলাপী তার নতুন খদ্দেরটির যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবে। অকারণেই মনে হয় তার দু'চোখ বয়ে কোনো দূরতম স্মৃতি যেন গরম পানির নদী হয়ে নেমে আসে। গোলাপী বিছানায় লুটিয়ে পড়ে বালিশ আঁকড়ে ধর ফুঁপিয়ে কাঁদে। কেউ ডাকলে দুয়ার মেলে না। আবার নিজের তাগিদে যেন নিজেই বিছানা ছেড়ে উঠে চোখে পানির ঝাপটা দিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করে নেয়। ঘরের শিকল তুলে দিয়ে ডোলা হাতে নিজেই বাজার করতে বেরোয়। মাছ আর তরকারী হাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে পছন্দমত বাজার করে ঘরে ফিরে এসে যত্ন করে রাঁধে। এসময় সর্বক্ষণ গোলাপী গুণ গুণ করে গান গায় আর তরকারীতে মশলার ফোঁড়ন দেয়। বাগাড়ের ছ্যাঁত ছ্যাঁত আওয়াজ শুনেই প্রতিবেশী মেয়েরা বুঝতে পারে গোলাপীর নতুন বাবু আজ রাতে গোলাপীর ঘরে খাবে।

হাট ভেঙে গেলেও সাহাবাবুদের নতুন ভাড়া করা বাঁশবেতের আড়তে কেরোসিনের হারিকেন জ্বলছিল। দোকানের মালিক মাধব সাহা তখনও হিসাব মেলাচ্ছে। কর্মচারীরা কেউ তামাক টানছিল, কেউ আজ সারাদিনের বেচাবিক্রির পর বেতের ঝুড়ি, চাটাই, বাঁশের ধাড়ি ইত্যাদি ঠিক করে সাজিয়ে রাখছিল। এর মধ্যেই সবাই বলাবলি করছিল, তাদের পৈতৃক ব্যবসায়ের জন্য অর্থাৎ বাঁশবেতের কারবারের জন্য মোল্লা সাহেবের এ দোকানটা বেশ পয়া। প্রথম দিনেই হাজার দুয়েক টাকা আমদানী সোজা ব্যাপার নয়। মাধব সাহা খাতা লেখা শেষ করে ক্যাশ মিলিয়ে মাথা তুললেন। সামনে সাহাবাবুর বড় ছেলে ললিত। ললিতের দিকে তাকিয়ে মাধব সাহা জিজ্ঞেস করলেন, 'তৈমুর মিয়া ভাড়ার টাকার জন্য দুপুরে লোক পাঠাবেন বলেছিলেন, কেউ এসেছিল?'

'না কেউ আসেনি। বাড়ি যাওয়ার সময় আমিই ওদের ওখানে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসতে পারি।'

বলল ললিত।

'মন্দ হয় না। তুই নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে এলে তৈমুর মিয়া খুবই খুশী হবেন। তাছাড়া এমন ভালো জায়গায় দোকানটা পেয়েছি, মালিকপক্ষকে একটু খুশী রাখাও দরকার।'

'তাহলে টাকাটা গুণে আলাদা করে রাখুন। আমি দোকান বন্ধ করে সড়ক বাজার যাব।'

ললিতের কথায় সাহাবাবু টাকা গুণে বাকসের ওপর একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে বলল, 'এখানে বারো শো টাকা আছে। এক বছরের অগ্রিম। দেয়ার সময় গুণে দিস।'

সাহাবাবু বেরিয়ে গেলেন। ললিতও দোকান বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়াল। সড়ক বাজার যেতে হলে সামনের গলি ধরে গেলেই তাড়াতাড়ি হয়। যদিও হুক্কা পট্টি দিয়েও একটা রাস্তা আছে। কিন্তু হাট বাজারের তরুণ ব্যবসায়ীরা খারাপ পাড়ার রাস্তাটাকেই কেন জানি বেশী ব্যবহার করে। দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রূপোপজীবীনীর অবৈধ আকর্ষণই হাটের মানুষকে এ পথে চলতে বেশী আকর্ষণ করে। ললিত দোকান থেকে বেরিয়ে কাঁঠালী বটের নীচে এসে দেখল, গলিটির মাথায় কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গলির দিকে পা বাড়াতেই সারোয়ার চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে পড়ে গেল। সারোয়ার ললিতের বন্ধু। একই স্কুলে একসময় লেখাপড়া করত। এখন হঠাৎ সারোয়ারকে সামনে পেয়ে ললিত বলল, 'আরে, তুই কোত্থেকে এলি? ভাড়ার টাকার জন্য দোকানে যাচ্ছিলি বুঝি? তোদের লোকের জন্য বসে থাকতে থাকতে একটু আগে বাবা

আমাকে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি গেছে। ভালোই হল তোর সাথে দেখা হয়ে গেল। টাকাটা নিয়ে যা। আমি টাকা নিয়ে তোদের গদিতে রওনা হয়েছিলাম।'

সারোয়ার প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও মুহূর্তের মধ্যে ললিতের এ ধরনের কথাবার্তার কারণটা আঁচ করে ফেলল, 'তুই কেমন আছিস শালা সাঁও? একেবারে পাক্কা ব্যবসায়ী হয়ে গেছিস।'

ললিত হাসল, 'নে এখানে বারো শো টাকা আছে। তৈমুর ভাইকে বলিস আমাদের নামে উসুল দিতে। তোকে পেয়ে ভালোই হল। নইলে একবার সড়ক বাজারে ঢুকলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হত না। টাকাটা গুণে নে সরো।'

'গুণতে হবে না শালা, আমি জানি তুই কম দিবি না।'

টাকার বান্ডিলটা সারোয়ার পকেটে পুরল। যেন মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। দু'জনই দু'জনের হাত ধরে একটু হাসল। বহুদিন পরে সাক্ষাতের পরিতৃপ্ত হাসি।

ললিত বলল, 'তাহলে আসি রে সরো। তোদের দোকান নিলাম, মনে হয় এখানে বেচাবিক্রি জমবে। একদিন গদিতে এসে চা খেয়ে যাস।'

'আসব।'

সারোয়ার আনন্দটা অনেক কষ্টে চেপে আছে। এমন অযাচিত পাওয়ার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অথচ এ মুহূর্তে তার টাকারই দরকার বেশী।

ললিত চলে গেলে সারোয়ার সোজা পাড়ার ভেতর ঢুকে গোলাপীর দরজায় এসে দাঁড়াল।

১৩

এবার সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা কিংবা কিছু নগদ হাতানোর ইচ্ছেটা আমজাদ মিয়াকে সম্বরণ করতে হল। বড় আম্মা তাকে যথার্থ বুদ্ধি বাৎলিয়ে রাশ টেনে রাখার ফলে সে আনোয়ারাকে নিয়ে প্রথম ময়মনসিংহ ও পরে বাসা ভাড়া করে আনোয়ারাকে কলকাতায় নিজের কাছে রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হল। সবি বড় আম্মা আগে বেড়ে পরিবারের সবার সামনে সকলকে শুনিয়ে সমাধা করলেন। জাহানারা ভাবল, এতদিন বড় আম্মা সতীনের ছেলে-মেয়েদের সাথে যে ধরনের আচরণই করুন, আব্বার মৃত্যুর পর যেহেতু তিনিই এ বাড়ির প্রকৃত মুরুব্বী, সে কারণে হয়তো আনুর জামাইকে তিনি আনুর শ্বশুর বাড়ির দুঃখ-কষ্টের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বিয়ের সময় কথা ছিল আমজাদ আনুকে গাঁয়ে ফেলে রাখবে

না। সে যদি কলকাতাতেই কাজকর্ম জোটাতে পারে তবে আনুও তার সাথেই থাকবে। এই শর্তেই মোল্লা সাহেব আমজাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সমুদয় খরচ বহন করতে সম্মত হয়েছিলেন। আমজাদ কেবল শ্বশুরের ধরাবাঁধা মাসিক বরাদ্দে সন্তুষ্ট থাকার পাত্র ছিল না। সে মাঝে-মধ্যেই শ্বশুরকে আরও টাকা পাঠানোর জন্য বিব্রত করত। শেষের দিকে মোল্লা সাহেব আমজাদকে মাসে মাসে টাকা পাঠানোর ভারটা তৈমুরের কাছ থেকে নিজের কাছেই নিয়ে নেন। সম্ভবত তিনি কত টাকা তার ছোট মেয়ের বিদ্বান জামাতাকে পাঠাচ্ছেন তা তার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী তৈমুরকে জানতে দিতে দারুণ অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। তাছাড়া তৈমুর তো কেবল জাহানারার জামাইই নয়, মোল্লা সাহেবের আপন ভাতিজাও। তিনি শেষের দিকে আমজাদকে নিজেই মানি অর্ডার করে টাকা পাঠাতেন। টাকার পরিমাণ নিয়ে তৈমুরের সাথে আলাপ-আলোচনাও করতে চাইতেন না। অথচ তাঁর আর্থিক লেনদেনের সব গোপনীয়তাই তিনি তৈমুরের সাথে বিশদ পরামর্শ না করে করতেন না, অন্তত তৈমুরকে অবহিত রাখাটা তার অভ্যেস ছিল। কিন্তু আমজাদের ব্যাপারে তিনি নিজেই আলাদা একটা হিসেবের খাতা রেখেছিলেন। তাও খাতাটা আবার পরিবারের অন্য কারো নজরে পড়ে সে আশংকায় তা আলাদা করে বাড়ির লোহার সিন্দুকের গোপন কুঠুরীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যদিও আমজাদকে অতিরিক্ত পাঠানোর হিসেবটা মোল্লা সাহেব ছাড়া কেউ জানত না, কিন্তু আমজাদ যে বিয়ের সময়কার প্রতিশ্রুতির অধিক অর্থ নিচ্ছে তা সম্ভবত বড় আম্মার অজানা ছিল না। জানলেও বড় আম্মা এ ব্যাপারে মোল্লা সাহেবকে কোন প্রশ্ন করেননি কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। তিনি বুঝতেন আনুকে বিয়ে দিয়ে বাদশা মোল্লার মত চতুর হিসেবী মানুষও ঠকেছেন। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে তিনি চাননি। তাছাড়া বড় আম্মা নিঃসন্তান হওয়ায় সতীনের মেয়েদের প্রতি এক ধরনের মমতাও হয়তো বোধ করতেন। এখনও করেন। এ জন্যই আমজাদ মিয়াকে তিনি আনুর ব্যাপারে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আনুকে গাঁয়ে ফেলে রাখাটা বড় আম্মারও অস্বস্তির কারণ। হাজার হোক তার সৎ মেয়েরা প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে। কষ্ট কাকে বলে তা জানু বা আনু কেউই জানেন না। গাঁয়ের গেরস্ত বাড়ির ধান-পাট ঝাড়াই-বাছাই বা গরু-বাছুর সামলানোর কাজকর্ম আনু কি করে করবে? তবুও আমজাদ যে আনুকে ময়মনসিংহের এক অজপাড়াগাঁয়ে ফেলে রেখে কলকাতায় বাবু সেজে থাকতে পারছে, সেটা কেবল মেয়ে হিসেবে আনুর পারিবারিক শিক্ষার গুণেই। আনু তার বাপ জীবিত থাকতে কোনোদিনই শ্বশুর বাড়ির দুর্নাম বা স্বামীর ব্যাপারে নালিশ জানায়নি। তবে মোল্লা সাহেব মাঝে-মধ্যে হয়তো বড় বিবির সামনে নিজেকে

চেপে রাখতে পারেননি। হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোনো দুর্বল মুহূর্তে বলেই ফেলেছেন, 'মা-মরা মেয়েকে আমি বোধ হয় শিক্ষিত জামাই পাওয়ার লোভে হাত-পা বেঁধে পানিতেই ফেলে দিলাম।'

এটুকু আক্ষেপের বেশী মোল্লা সাহেবের মুখ থেকে মেয়ে-জামাইয়ের বিষয়ে কোনো অনুযোগ শোনা যেত না। তবে তৈমুরের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করলেও তৈমুর সবি বুঝতে পারত। কারণ দোকানের ক্যাশ মেলাত তৈমুর নিজে। কোথায় কত টাকা খরচ হল, চাচা নিজের খরচ বাবদ কখন কত টাকা লিখে রাখতে তৈমুরকে বলতেন, এ থেকেই তৈমুর বুঝতে পারত চাচা যে কোনো কোনো মাসে নিজের খরচ বলে অস্বাভাবিক টাকার অংক লিখে রাখতে বলছেন টাকাটা কোথায় যায়। কিন্তু এ নিয়ে তৈমুর মিয়া কোনো উচ্চবাচ্য কিংবা নিজের স্ত্রীর সাথে কানাকানি করেনি।

আমজাদ সম্পত্তি বাটোয়ারার ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে পড়েছে দেখে বড় বিবি একটু ধৈর্যের দাওয়াই হিসেবে নগদ দেনা-পাওনা কিংবা স্থাবর সম্পত্তি দাবীর আগে তার অতিরিক্ত নেয়ার পরিমাণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলেছেন ভাগবাটোয়ারা তিনিও চান, তবে তাড়াহুড়ো করলে আমজাদেরই ক্ষতি হবে। যদি তৈমুর আয়রন চেষ্টে রাখা আমজাদের হিসেবটা জাহির করে দেয় তাহলে কে জানে আমাজাদের আদৌ পাওনা থাকে কিনা? এতে আমজাদ যখন ভয় পেয়ে কেঁচোর মত গুটিয়ে গেছে, তখনই বড় আম্মা তাকে তৈমুরকে ঠেকাবার উপায়ও বাৎলে দিলেন। বাজারের ব্যবসায়ী সমাজ ও দালাল-ফড়িয়াদের কাছে মোল্লা সাহেবের যে বেহিসেব অর্থ গচ্ছিত থাকত সে খবর তো একমাত্র তৈমুর ছাড়া এ বাড়ির সকলেরই অজানা। এ খবরটা নিয়ে কথা-তুলতে তিনি আমজাদকে উস্‌কে দিলেন। যাতে পরস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠলে তিনি সৎ মেয়েদের উভয় জামাতাকেই বশে রাখতে পারেন এ কারণেই তিনি আমজাদকে এবার ভাগবাটোয়ারার চেষ্টা ছেড়ে কর্মক্ষেত্রে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আমজাদও শেষ পর্যন্ত বিষয়টা উপলব্ধি করে আজ দুপুরের গাড়িতেই আনোয়ারাসহ ময়মনসিংহ ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভোরে তৈমুরের কামরায় এসে কড়া নাড়ল।

জাহানারা তৈমুরকে সাধারণত খুব ভোরেই নাস্তা খাইয়ে বাজারে বিদেয় করে। তৈমুর সকালে পুকুর ঘাট থেকে গোসল করে সবেমাত্র পোশাক পরেছে। সে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে এ সময় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দুয়ার খুলে দিতেই আমজাদ সালাম বলল। তৈমুর বলল, 'আসুন ভেতরে। এত সকালে কি ব্যাপার?' তৈমুর দুয়ার ভেড়ে দাঁড়াল, 'আপনার বিবি সাহেবা বোধ হয় এখনও

সজাগ হননি। চলুন পাক ঘরে গিয়ে নাস্তা করি। আমার আবার বাজারে যাবার তাড়া।'

'আরে দুলাভাই, চিরকালই তো আপনার কেবল বাজার-বেসাতের দিকে ছোটাছুটি। একদিনও আপনাকে একটু একলা পাই না যে একটু আমাদের মত গরীবদের সুখ-দুঃখের কথা বলব।' আমজাদ কথা বলতে বলতে ভেতরে প্রবেশ করল, 'বুজান বোধ হয় পাক ঘরে গেছেন। চলুন সেখানেই গিয়ে বসি। আমি আজ রওনা হব কিনা, আপনাদের অনুমতি নিতে এলাম।'

'সে কি জামাই মিয়া?'

তৈমুর একটু অবাকই হল। আনোয়ারা যে জামাইসহ আজই চলে যাচ্ছে, কই এ কথা তো জানু তাকে আভাসেও বলেনি? 'রওনা হবেন মানে? আপনি কি আনুকে নিয়ে দেশে ফিরতে চাচ্ছেন?'

'শুধু আনুকে নিয়ে বাড়ি ফেরাই নয়, সুযোগ পেলে আপনার শালীকে নিয়ে বাড়ি হয়ে সোজা কলকাতায়।'

'খুবই সুখের খবর জামাই মিয়া। আমিও চাই আপনি আনুকে আপনার সাথেই রাখুন। কলকাতায় কি আগেই বাসা ভাড়া পেয়েছেন?'

'আপাতত আমার এক চাচার বাসায় গিয়ে আনু উঠবে। আপনি তো আমার চাচাকে চেনেন। ঐ যে 'আজাদ' পত্রিকার প্রেস ম্যানেজার সামাদ সাহেব। তারপর ফোলেন স্ট্রীটের দিকে একটা বাসা খুঁজে নিতে বড়জোর এক সপ্তাহ লাগবে।'

হাত কচলে নিজের কৃতিত্ব জাহির করার ভঙ্গী করল আমজাদ।

'শাশুড়ী-আম্মাদের কাছে এসব বলেছেন?'

'বড় আম্মাকে বলেছি। এখন আপনাকে আর বুবুকে বলে ইজাযত নিতে এসেছি।'

'হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে নতুন বাসা বাড়ি ভাড়া করে থাকা তো বেশ ঝক্কির ব্যাপার। কিছু টাকা পয়সা লাগলে জানুর কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। কোন সংকোচ করবেন না। আমি এক্ষুণি জানুকে বলে দিচ্ছি। চলুন ও ঘরে গিয়ে নাস্তা করি।'

তৈমুরের এ অযাচিত প্রস্তাবে আমজাদ সহসা কেমন একটু বিনম্র ভঙ্গীতে মাথাটা নুইয়ে রাখল, 'আপনি দুলাভাই সত্যি খুব ভালো। এ সময় কিছু টাকা পেলে কি যে উপকার হবে?'

'সেতো বুঝি। আপনার না হয় চাইতে সংকোচ। কিন্তু আপনার স্ত্রীটি তো দরকারের সময় নিজের বোনের কাছে অসুবিধের কথা বলতে পারে। যা হোক,

হাজারখানেক হলে আপাতত চলবে না?'

'খুব চলবে।'

'তাহলে নিয়ে যান। আগামী মাসে আমি মাল কিনতে কলকাতায় গেলে আপনাদের দেখে আসব। চলুন আমি মাহমুদের আম্মাকে আনুর হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে দিতে বলছি।'

তৈমুরের কথায় আমজাদ যেন হাতে স্বর্গ পেল। আনুকে নিয়ে কলকাতায় তার কর্মস্থলে বাসাবাড়ি করে থাকার পরামর্শটা তাকে দিয়েছেন বড় আম্মা। আমজাদের ওপর এ বাড়ির কেউই সন্তুষ্ট নয়। সে তার বিয়ের সময়ে দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখেনি বলে মোল্লা সাহেবও অসুখী মন নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। বড় বিবি চান অচিরে না হোক বছরখানেকের মধ্যে মোল্লা সাহেবের সকল স্থাবর-অস্থাবরে তার অংশ হাতে পেতে। অথচ এই পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল এই অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মোল্লা সাহেবের ব্যবসা-বাণিজ্য তার মৃত্যুর সাথে সাথেই ভেঙে পড়ুক, সেটা চান না। তারা তৈমুরকে দিয়ে বাদশা মোল্লার দোকানপাট ও পাটের আড়তদারী চালিয়ে যেতে চান। মৌড়াইল গাঁয়ের লোকদেরও সমর্থন তৈমুরেরই পক্ষে। এমনকি মিশনের ফাদার জোনস্, যিনি মোল্লা সাহেবের পরম বন্ধু ও হিতৈষী, তিনিও তৈমুরকেই সাহায্য করছেন। এ অবস্থায় তৈমুর যদি বাদশা মোল্লার দোকানপাট, খামার, পাটের ব্যবসা ঠিকমত সামলে উঠতে পারে তাহলে দশ বছরেও বড় বিবির পক্ষে সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারার প্রশ্ন তোলা সম্ভবপর হবে না। যত দিনে না জানু-আনুর ভাইয়েরা বড় হয়ে দাঁড়িয়ে ভগ্নিপতির কাছ থেকে তাদের পৈতৃক ব্যবসায়-বাণিজ্য বুঝে নিতে চায়। বড় বিবির পক্ষে ততদিন মুখ বুজে থাকা কি করে সম্ভবপর? এ কারণেই তিনি আমজাদকে হাতে রেখে কাজ উদ্ধার করতে চান। আবার তৈমুরকেও চটিয়ে একেবারে হাতছাড়া করার বিপদটা তিনি বোঝেন। তিনি নিজে জানেন, তৈমুর দিনরাত খেটে শ্বশুরের ব্যবসাপত্র ঠিকমত সাজিয়ে তুলছে। কিন্তু তৈমুর যা কিছু করছে তা তার আপন শালা বা চাচাতো ভাইদের স্বার্থে, বড় বিবি বা ছোট বিবি কিংবা আনুর জামাইয়ের স্বার্থের কথা তৈমুর ভাবছে না। অথচ এরা সকলেই চায় সম্পত্তি এবং নগদ অর্থের আশু ভাগাভাগি। এতেই এদের লাভ। তৈমুরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার অর্পণ করা না গেলেও সেটা হত। কিন্তু তৈমুরের যোগ্যতা এবং বাদশা মোল্লার পরিবারের প্রতি স্থানীয় মাতব্বরদের মহব্বতজনিত কারণেই ডাঃ নন্দলাল তৈমুরের হাতে সব কিছুর চাবি তুলে দিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় কারো প্রতিবাদের কোনো সাহসই ছিল না। এখন বড় বিবি আমজাদের লোভকে কাজে লাগাতে চান। কিন্তু তার আগে এ

বাড়ির সকলের মন জয় করতে আমজাদকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করতে চান বড় বিবি। তিনিই এখন আনোয়ারাকে গাঁয়ের বাড়িতে না রেখে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। এতে জাহানারা যেমন খুশী হবে, তেমনি খুশী হবে গাঁয়ের এদের সকল আত্মীয়-স্বজন। আজ বড় আম্মার পরামর্শেই আনুর জামাই আনুকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার কথাটা তৈমুরের কানে তুলেছে এবং এর আশাতীত প্রতিক্রিয়া দেখে এখন একেবারে অভিভূত।

আমজাদকে সাথে নিয়ে তৈমুর রান্না ঘরের চৌকাঠ পেরুতেই জাহানারা একটু অবাক হল, 'কি ব্যাপার! দু'ভায়রা এমন সাত সকালে এক সাথে নাস্তা খেতে এলে যে? কোন মতলব আছে নাকি?'

'তোমার বোনজামাই আনুকে নিয়ে আজই ময়মনসিংহ যাচ্ছে। দুপুরের গাড়িতে। বেচারার সাথে এখানে আসার পর একবেলাও লোকমা ধরার ফুরসত পাইনি।'

তৈমুর এসে বিছানো মাদুরে আমজাদকে নিয়ে বসল।

'আনু চলে যাচ্ছে মানে? কই আনু তো আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি!'

বেশ একটু অবাকই হল জাহানারা।

'হ্যাঁ আপা। আপনাকে জানাবে কিভাবে, গত রাতেই তো আপনার বোনের সাথে আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটার সিদ্ধান্ত হল। ভাবলাম ভোরে আপনাকে আর দুলাভাইকে জানাব।'

অস্বাভাবিক হলেও বেশ বিনীত গলার আওয়াজ আমজাদের।

জাহানারা বিস্মিত চোখ তুলে আমজাদকে দেখল।

'আরও একটা সুখবরও আছে। আমাদের জামাই মিয়া আনু বিবিকে এ মাসেই কলকাতায় নিয়ে রাখছে। এখন থেকে তোমার বোন কলকাতা শহরেই থাকবে। তুমিও মাঝেমধ্যে সেখানে গিয়ে বেড়াতে পারবে। আর আমাকেও মাল কিনতে গিয়ে এখন থেকে আর হোটেলে থাকতে হবে না। বুঝলে? দাও, নাস্তা দাও। সময় কম, আমাকে আবার এখনই বাজারে ছুটতে হচ্ছে।'

সামনে রাখা চালের তৈরী সাদা রুটির স্তূপ থেকে কয়েকটা রুটি নিজের পাতে তুলে নিল তৈমুর। আমজাদকেও প্লেট এগিয়ে দিল। আমজাদ মুরগীর ঝোলে রুটি ভিজিয়ে মুখে তুলতে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ আপা, আনুকে এবার যাওয়ার সময়ই সাথে করে নিয়ে যাব। আহা কিছুকাল আগেই যদি আপনার বোনকে সাথে করে নিয়ে যেতাম তাহলে আমার শ্বশুর মনে কত সুখ নিয়ে যেতে পারতেন। আমার আলসেমী আর কলেজের ঝামেলার জন্যই কিছু হল না।' আমজাদ ঢোক গিলল। জাহানারা পানির গ্লাস এগিয়ে দিলে আমজাদ ঢক ঢক করে পানি খেল। সে বুঝতে পেরেছে জাহানারা ও তৈমুর উভয়েই আনুকে

কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কথায় যারপরনাই আনন্দিত। 'এতদিন আপনাদের বোনকে আমি গাঁয়ের বাড়িতে রেখে গিয়ে আপনাদের মনের মধ্যে খুব পেরেশানি সৃষ্টি করেছি সন্দেহ নেই। তবে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন তাকে দিয়ে আমার মা কোন লওয়াখোয়ার গৃহস্থালীর কাজই করায়নি। অলস হয়ে গাঁয়ে পড়ে থাকার চেয়ে আমার সাথে কলকাতাতেই থাকুক। কি বলেন দুলাভাই?'

তৈমুর হেসে ফেলল, 'ঠিকই তো। বউ কাছে থাকলে বিদ্বান মানুষের নানাদিকে চোখ যায় না। পিপাসাও কম পায়, ঘরেই যখন সরবত!' খুশীতে উচ্ছসিত তৈমুর। অনেকদিন পরে ভায়রার সাথে কৌতুক করার সুযোগ মিলেছে। 'আরে দেখ ভুলে গিয়েছিলাম মাহমুদের মা। যাবার সময় আমাদের আনু বিবির হাতে এক হাজার টাকা গুণে দিয়ে দিও। বড় শহরে গিয়ে নতুন সংসার পাতবে। আলমারীতে গত রাতে যে তহবিল রেখেছি সেখানে এক হাজার আছে। এবার আমি উঠি।'

১৪

সকালে দোকানে পা দিয়েই তৈমুরের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। গোমস্তা ফিরোজ তৈমুরকে জানাল যে সকালে সাহাবাবুদের বড় ছেলে ললিত এদিক দিয়ে যাবার সময় জানিয়ে গেছে, সে নিজে সারোয়ারকে তাদের দোকানের এক বছরের ভাড়ার টাকা বুঝিয়ে দিয়েছে।

কথাটা শুনে তৈমুর কতক্ষণ থ হয়ে পাপোসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ফিরোজের অস্বস্তি ভরা মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'ভাড়ার টাকাটার উসুল খাতায় লিখে রাখ।'

'ক্যাশ না পেয়েই উসুল লিখতে বলছেন মহাজন?'

'কি করবে? মালিকের হাতে টাকা বুঝিয়ে না দিয়ে তো ললিত একথা বলেনি। খাতায় জমা লিখতে হবে।'

'সারোয়ার মিয়া কি টাকাটা জমা দেবে ভেবেছেন?'

'তা না দিলেও টাকা আমরা পেয়েছি এটাই লিখতে হবে। পরে সারোয়ারের নামে ভাড়ার টাকাটার খরচ দেখাতে হবে।'

তৈমুরের কথায় ফিরোজ খেরোখাতা টেনে হিসেবটা লিখতে লাগল। এ সময় সারোয়ার এসে দোকানে ঢুকছে দেখে ফিরোজ কলম রেখে টুলের ওপর বসল। মনে হয় এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। চোখ জোড়া অস্বাভাবিকভাবে

ফোলা এবং অনিদ্রায় লাল হয়ে আছে। চুল শুকনো, উস্কুখুস্কু। পোশাকের কোনো শ্রী নেই।

তৈমুর সহসা তাকে টাকার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন না করে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে নাকি সারোয়ার?'

সারোয়ার ভগ্নপতির কাছে অতটা ভদ্র ব্যবহার আশা করেনি। সে হতচকিতের মত জবাব দিল, 'না দুলাভাই, আমি একটা কথা বলতে এই সাত সকালে দোকানে ছুটে এসেছি।'

'আমি জানি তুমি কি বলবে। ললিতের দেওয়া টাকাটা আমি খাতায় উসুল দিয়ে দিতে বলেছি। তবে কাজটা তুমি ভালো করনি, নিজেই চিন্তা করলে বুঝতে পারবে। টাকার দরকার হলে তোমার বোনের কাছেও চেয়ে নিতে পারতে। আমি তোমাদের ব্যবসা দেখি, হিসাবপত্র ঠিক রাখতে হয় আমাকে। আজ না হোক কাল এই টাকার হিসেব আমাকে দিতে হবে।'

'টাকাটা আমার খুবই দরকার ছিল।'

'দরকারটাও আমি জানি। তুমি নিজেকে এভাবে নষ্ট করে ফেলতে চাইলে ভেনো না তোমার বোন আর আমি তা বসে বসে দেখতে থাকব। হয় তোমাদের কাজ কারবার আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, নইলে তোমাকে ওপথ ছেড়ে দিতে হবে।'

সারোয়ার মাথা নুইয়ে বসে থাকল। কোনো জবাব তার মুখে আসছে না। সে তৈরী হয়ে এসেছিল তৈমুরের সাথে কথা কাটাকাটি করার ইচ্ছেয়। কিন্তু এখন তৈমুরের মুরুব্বীর মত আচরণ এবং দায়দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে সারোয়ার থমকে গেল। এখন সে কি বলবে? হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমার লেখাপড়ায় মন বসছে না।'

এ কথায় তৈমুর কতক্ষণ সারোয়ারের চেহারার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ফিরোজ মিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'যাও তো সামনের দোকান থেকে কিছু নাস্তা আর চা নিয়ে এস।'

ফিরোজ উঠে গেলে তৈমুর সারোয়ারের দিকে ফিরে বলল, 'কি করবে তাহলে ব্যবসা?

'ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে উস্কুল-টিস্কুল আমার পোষাবে না।'

'তোমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আর মাত্র আড়াই মাস বাকী, তোমার বড় বাই গত বছর নানা ছুতোয় পরীক্ষা না দিয়ে এ বছর তোমার সাথেই দিতে যাচ্ছে। তুমি মোটামুটি খারাপ ছাত্রও নও। পরীক্ষাটা একটু মনোযোগ দিয়ে দিতে পারলে পাশ করে ফেলবে।'

'আমার কোনো প্রিপারেশন নেই।'

'এখনও সময় আছে সারোয়র।'

'পড়াশোনা আমার ভালো লাগছে না, দুলাভাই।'

'নিজের সর্বনাশ এভাবে কেউ করে না। দরকার হলে বাজারের লোকজন ডেকে পাড়ার ঐ খারাপ মেয়েটাকে আমি শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি, সারোয়ার। কিন্তু তা করতে যাবো না, যদি তুমি পরীক্ষা দিতে রাজী হও।' তৈমুর ক্যাশের পেছন থেকে সোজা উঠে এসে সারোয়ারের সামনে বসল, 'তুমি কেমন মানুষের ছেলে তাকি তুমি জানো না?'

'জানবো না কেন? আমার বাপ এ শহরের একজন ধনী-মানী লোক ছিলেন। কিন্তু তারও দোষ ছিল।'

'এ ধরনের কথাবার্তা আমি তোমার মুখ থেকে আর একটুও শুনতে চাই না সরো।'

'আপনি রাগ করছেন।'

রাগের কি দেখলে? তিনি আমার চাচা এবং শ্বশুর ছিলেন। তার কাছে আমি ব্যবসা-বাণিজ্য শিখেছি। তিনি সব ব্যাপারে আমার ওস্তাদ ছিলেন। মানি, তার কিছু নেশার ব্যাপার ছিল, কিন্তু তার মত বড় হৃদয়ের মানুষ এ শহরে আর কাউকেও পাইনি। নিজের চেষ্টায় একজন গোমস্তা থেকে তিনি রাজার ভান্ডার সঞ্চয়ের যোগ্যতা দেখিয়েছেন। তোমাদের জন্য রেখে গেছেন রাজত্ব। এ রাজত্ব হেলায় নষ্ট হতে দিতে পারি না। তোমার যদি কোনো কারণে একাকি লাগে আমাকে বল, আমি ও তোমার বোন এ তল্লাটের সবচেয়ে উঁচু ঘরে তোমার জন্য সম্বন্ধ করাব। সবচেয়ে খুবসুরত বৌ জোগাড় করে আনব তোমার জন্য। এখনও সময় আছে, সর্বনাশের পথ থেকে তুমি সরে এসো সারোয়ার।'

অনেকটা মিনতির মতই শোনা গেল তৈমুরের কথাগুলো। সারোয়ার কেমন যেন এসব কথায় একটু বিহ্বল হয়ে পড়ে বলে ফেলতে বাধ্য হল, 'তাহলে এখন আমাকে কি করতে বলেন দুলাভাই?'

'পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে বলি। তোমাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হবে। খানিকটা লেখাপড়া জানা থাকলে পরবর্তী জীবনে এ শহরে আমাদের পরিবারের শত্রুরা তোমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে সাহস পাবে না। আমি জানি তোমাদের, শওকত বা সারোয়ারের জীবনে কোনোদিন কোনো অবস্থায় কারো চাকুরী করে খেতে হবে না। তোমাদের জন্য আমার চাচা যথেষ্টই রেখে গেছেন। তবে এটাও মনে রেখো, মুর্খ হয়ে থাকলে এই রাজার ভান্ডার রক্ষা করতে পারবে না।'

ফিরোজ চা-নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

'নাও, আমার সাথে নাস্তা খাও। আমি অবশ্য সকালে বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হল, সকালে ঠিকমত খেয়ে বেরোওনি।'

তৈমুরের আদেশে সারোয়ার একটা ডিম পোচ পিরিচ থেকে তুলে খেয়ে নিল। সামনে গরম ডালপুরি, মহাদেব মিষ্টান্ন ভান্ডারের ফ্রেস সন্দেশ ও সরবি কলা পেয়ে সারোয়ার তৃপ্তির সাথে নাস্তা করল। চায়ের কাপটা হাতে নিয়েই সারোয়ারের মনে হল, তৈমুর প্রকৃতপক্ষে তার শত্রু নয়। হাজার হোক তার ভগ্নিপতি, আপন চাচাত ভাই। পর তো নয়। এতক্ষণ পর্যন্ত তৈমুর যা বলেছে সবি তো তার এবং তার ভাইদের মঙ্গল চিন্তা করেই। অথচ বাড়ির অন্যান্য শরিকদের ধারণা, তৈমুর ও তার বড় বোন জাহানারা আখের গোছাচ্ছে। এমনকি আনু বুবু'র জামাই পর্যন্ত একই সন্দেহ বাতিকে ভুগছে।

খাওয়া হয়ে গেলে চায়ের কাপটা রেখে সারোয়ার হঠাৎ তৈমুরের দিকে মুখ তুলে হাসল, 'পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে এখন দু'জন প্রাইভেট টিচার লাগবে। সারা বছর তো আমি বই ছুঁয়ে দেখিনি। ইংরেজী আর অংকটা এ আড়াই মাসে কভার করতে পারলে হয়।'

'বল কাকে ঠিক করে দেব? আমি নিজে গিয়ে অন্নদা স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক আর এডোয়ার্ড স্কুলের সেই অংকের স্যার অরিন্দম ঘোষকে আজই তোমাকে দু'বেলা বাড়িতে এসে পড়াতে বলে দেব।'

'না বাড়িতে আসতে হবে না। আমি নিজে গিয়েই স্যারদের বাসায় কোচিং করে আসব।'

এ কথায় তৈমুর বুঝল যে সারোয়ার নিয়মিত বাড়িতে রাত কাটাতে পারবে না বলেই এই আপত্তি। নিজেই টিচারদের বাসায় গিয়ে পড়ে আসতে চায়। বাজারের মেয়েটির মোহ ত্যাগ যে সহসা সম্ভব নয় এটা বুঝতে বাকী রইল না। তবুও সারোয়ারকে যে এতটুকু বশ মানানো গেছে এতেই তৈমুর খুশী। বলা যায়, এক আকস্মিক অসাধ্য সাধন।

'ঠিক আছে, তোমার যেমন মরজি। আমি একটু পর স্যারদের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলে আসবো। সময়ও ঠিক করে এসে তোমার বোনকে জানাব। তুমি তার কাছ থেকে জেনে নিও।'

'না দুলাভাই, বুবুকে এসব বলার দরকার নেই, আমিই কাল সকালে এসে আপনার কাছ থেকে পড়ার রুটিনটা জেনে যাব। বুবু আমার ওপর ক্ষেপে আছেন। তাকে শুধু বলবেন আমি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। যেখানেই থাকি, আমি এখন থেকে বই নিয়েই থাকব।'

বলল সারোয়ার।

তৈমুর আন্দাজ করল, সারোয়ার খারাপ পাড়ার গোলাপী মেয়েটির প্রতি একেবারে মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। সম্ভবত সে সেখানেই বইপত্র নিয়ে পড়ার কথা ভাবছে। তৈমুরের মনটা এতে দমে গেলেও সে মনের অবস্থাটা গোপন রাখার চেষ্টা করল, 'তুমি যখন বলছ যেখানেই থাকো বই নিয়েই থাকবে, তখন তোমার বোনকে আমি বোঝাতে পারব।'

'তাহলে আমি উঠি দুলাভাই। ও আর একটি কথা, ভাড়ার টাকার সবটিই আমি খরচ করে ফেলিনি। এখনও সাত-আটশো টাকা অবশিষ্ট আছে। টাকাটা ফিরোজ মিয়াকে বলুন জমা নিতে।'

বলতে বলতে পকেট থেকে টাকার একটা চামড়ার খুতি বের করল সারোয়ার। তৈমুর বলল, 'থাক ও টাকাটা তোমার পরীক্ষা উপলক্ষে ব্যক্তিগত খরচের জন্য আমি দিলাম। ও টাকা আর ফেরত দিতে হবে না। টাকাটা পারিবারিক ব্যয়ের খাতেই লেখা হবে। তুমি এখন আমার সাথে কথা দিলে আমি ওতে বিশ্বাস করলাম। আশা করি, বিশ্বাস ভঙ্গের মত তুমি কিছু করে তোমার বোনকে কষ্ট দেবে না।

সারোয়ার এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে দোকান থেকে মাথা নুইয়ে বেরিয়ে এল।

বেলা তিনটার দিকে সারোয়ার একগাদা বই একটা ছালার বস্তায় নিয়ে এসে খারাপ গলিটার মুখে দাঁড়াতেই কাঁঠালী বটের নীচে পানের দোকানের সামনে দুপুরের আলস্য-যাপনরত মেয়েরা হঠাৎ চকিত হয়ে সারোয়ারকে দেখতে লাগল। একজন কুলি বস্তাটা এনে গলির মুখে নামিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেছে। কেউ জানে না বস্তার ভেতর কি আছে। সবারই ধারণা, গোলাপীর এই অর্বাচীন খদ্দের বোধ হয় গোলাপীর জন্য কোনো হাটবাজার করে এনেছে। সকলেই তীর্যক দৃষ্টিতে সারোয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সারোয়ার বেপরোয়া। সে এক টানে বস্তাটা কাঁধে তুলে নিয়ে গলির ভেতরে ঢুকে গেল।

সারোয়ার এসে গোলাপীর দরজায় হাঁক দিতেই গোলাপী দুয়ার মেলে হতভম্ব। সামেনে সারোয়ার একটা ছালার বস্তা কাঁধে নিয়ে দাঁড়ানো।

'এসব কি?'

'বই আর খাতাপত্র।'

কাঁধ থেকে বস্তাটা ঘরের চৌকাঠের ভেতরে ঠেসে দিল সারোয়ার।

১৫

আনোয়ারা বরসহ চলে গেলে এত বড় বাড়িটাই যেন জাহানারার কাছে বড় ফাঁকা হয়ে গেল। যে কামরাটার জন্য আমজাদ জাহানারার সাথে বে-আদবী করেছিল, এখন সে কামরাটা খালিই পড়ে আছে। জাহানারা আর এ কামরায় ফিরে এল না। বরং শওকত ও সাফফাতকে তৈমুর বার বাড়ির দালান থেকে এখন এখানে এসে থাকতে হুকুম করেছে। কারণ বার বাড়িটা মূল দালান থেকে বেশ এক উঠোন দূর হওয়ায় জাহানারা তার ভাইদের দিকে ঠিকমত নজর রাখতে পারে না। প্রাইভেট টিউটর কখন আসে কখন যায় তা জাহানারা অনেক সময় বুঝতেও পারে না। তাছাড়া পড়ার সময়টুকু ছাড়া তার তিন ভাই কিভাবে সময় কাটায় এটাও জাহানারা ঠিকমত জানে না। সারোয়ারের ব্যাপারে এ বাড়ির সকলেই একরকম আশা ছেড়ে দিয়েছে। সে কারো কথা শোনে না। তার খারাপ পথে পা বাড়ানোর খবরটা মহল্লায় সবার ঘরেই আলোচ্য বিষয়। সকলেই সারোয়ারকে ভয়ের চোখে দেখে।

আনোয়ারাকে বিদেয় করেই জাহানারা বাড়ির মুনি-মানুষের সর্দার ইসমাইলকে বলল, 'ইসমাইল ভাই, আমার ভায়েরা আজ থেকে ভেতর-বাড়িতেই থাকবে। আপনি বার বাড়ি থেকে ওদের খাট আর বিছানাপত্র মাঝের কামরায় এনে পেতে দিন।'

ইসমাইল কথামত কাজ করল। শওকত, সাফফাত এবং সারোয়ারের বিছানাপত্র এনে মাঝের কামরায় পেতে দিয়ে হেসে জাহানারাকে বলল, 'তোমার এক ভাই তো আজকাল বাড়িতে থাকে না। তার আশা একেবারে ছেড়ে দিও না। সারোয়ারই আমার মালিকের একমাত্র পুত্র যার মাথায় একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। খারাপ পাড়ায় গেলেও সেই একদিন মোল্লা সাহেবের নাম রাখবে। তাকে হিসেব থেকে তুমি ও তৈমুর মিয়া একেবারে বাদ দিও না। আর দোষের কথা যদি বল, তাহলে ভেবে দেখো তোমার আব্বাজানেরও এসব দোষ ছিল। প্রথম জীবনে তারও নানা খারাপ অভ্যেস ছিল। আমি তার চাকর হলেও তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতই দেখতেন এবং অনেক সময় নিজের মনের কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। তার ধারণা ছিল একদিন সারোয়ারই এ সংসারের হাল ধরার মত হবে।'

'আমি সব জানি ইসমাইল ভাই। আমি জানি, সরো যদি তার দুলাভাইয়ের কাছে আমাদের কায়কারবারের কায়দাটা একটু শিখে নিতে পারে তবে আমার বাপের কষ্টের উপার্জন আর ব্যবসা-বাণিজ্য তলিয়ে যাবে না। মাহমুদের আব্বাও সরোর সুমতির জন্য চেষ্টা করছে।' বলতে বলতে জাহানারা ইসমাইলের পেতে দেওয়া খাটের ওপর বসল, 'এখন আমাদের ভয়ের ব্যাপার হয়েছে, সরো না বাজার থেকে একদিন একটা খারাপ মেয়েকে এনে এ বাড়িতে ঢুকিয়ে বলে যে, এই আমার বউ। তাহলে আমরা কোথায় যাব? তখন তো আমার পক্ষে আর এ বাড়িতে বসবাস করা সম্ভব হবে না ইসমাইল ভাই। তাছাড়া এ বাড়ির অন্য শরিকরাও তা মানবে কেন, আপনিই বলুন?'

'আমার তো মনে হয় না সারোয়ার এ কাজ করবে। এখন বয়েসের পাগলামীতে একটু এদিক-সেদিক করছে। তোমার অন্য ভাই দু'টোও যে ফেরেস্তা এটা ভেবো না।' ইসমাইল খাটে বিছানার চাদর বিছিয়ে হাত দিয়ে সমান করতে গিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, 'বড়জনকে আমি এতদিন ভাবতাম তোমার ভাইদের মধ্যে এটাই বুঝি একটু সোজা মানুষ। কাল দুপুরে গোলাঘর থেকে ধান বার করতে গিয়ে দুয়ার খুলে দেখি, সে বাড়ির জোয়ান কাজের ছেড়ীটাকে নিয়ে ধানের বস্তার ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে।'

'কে, শওকত? মর্জিনার সাথে? কই, আপনি তো আমাকে কিছু বলেন নি?' কেমন যেন আঁতকে উঠল জাহানারা।

'বলিনি, বললে কি হত? তোমার কেবল দুশ্চিন্তাই বাড়ত। মর্জি মেয়েটিকে আমি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি যদিও, কিন্তু আমি তো আর আমার মালিকের ছেলের গায়ে হাত তুলতে পারি না। সে গোলার ধান চুরি করে মেয়েটার বাড়ি পাঠাত। কত মণ ধান সে রাতের অন্ধকারে পাচার করেছে কে জানে? এ অবস্থায় কেবল সরো মিয়া খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে তোমাদের কপাল চাপড়ে লাভ নেই বোন। বরং তৈমুর মিয়াকে বল এদের বিয়ে-সাদী দিয়ে ঘর-সংসারী করে দিতে। এতেও তৈমুর মিয়ার শ্বশুরের প্রতি কিছুটা কর্তব্য পালন হবে।'

কথাগুলো বলে ইসমাইল কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলে জাহানারা পাথরের মত খাটের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

রাত বারোটার দিকে বড় বিবির ঘরের বাইরের শিকলটা একটু নড়ে উঠতেই তিনি নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে এলেন এবং সাবধানে দরজার খিল আলগা করে দিলেন। দরজাটা ফাঁক হতেই একটা কালো বোরখা পরা দীর্ঘ

ছায়ামূর্তি এসে বড় বিবির ঘরে ঢুকল। বড় বিবি আগের মতই নিঃশব্দে দুয়ারে খিল এঁটে দিয়ে খাটের ওপর এসে বসলেন। শিথানে রাখা বিশাল পানের বাটা থেকে একটা পান তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন এবং বালিশের তলা থেকে জর্দার কৌটো বের করে এনে হাতের তালুতে সুগন্ধি জর্দা ঢেলে মুখে তুলে বিকৃত গলায় বললেন, 'আমার কাছে এখন এসে লাভ নেই মর্জি। তোকে হাজারবার বলেছি ধরা পড়লে এ বাড়িতে তোর ঠাঁই হবে না। পেটে বাচ্চা যাওয়ার আগে সাবধান থাকতে আমি তোকে সতর্ক করেছি। এখন জাহান্নামে যা। ইসমাইল সব কাহিনী জানু আর জানুর জামাইকে জানিয়ে দিয়েছে। আমি আর তোকে আমার খাস বান্দী করে এ বাড়িতে রাখতে পারব না।' খাটের পাশে রাখা হারিকেন বাতিটা আরও একটু কমিয়ে দিলেন বড় বিবি, 'আমার সাথে দেখা করতে যখন তখন রাতবিরেতে এ বাড়িতে ঢুকবি না। মনে রাখিস, ইসমাইলের চোখ থাকবে এখন থেকে তোর ওপর। জানু যদি বুঝতে পারে তার ভাইয়ের পেছনে আমিই তোকে লাগিয়েছি, তাহলে খুব খারাপ হবে। এমনিতে আমি আমার সতীনের ছেলেদের মন্দ চাই না। চাই কেবল তৈমুরকে এ বাড়ির খবরদারী থেকে দূর করতে। ভেবেছিলাম তুই শওকত ছোকরাটাকে ভুলিয়ে যদি পেটে বাচ্চা ধরতে পারিস তাহলে এমন ব্যবস্থা করব যাতে তোর মত বান্দীর সাথে আমার সতীনের ছেলের বিয়ে দিতে সমাজ তৈমুরকে বাধ্য করে। তুই পারলি না। ইসমাইলের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলি। এখন যদি ওরা জেনে যায় তুই রাতের অন্ধকারে আমার সাথে দেখা করছিস, তাহলে ওরা ভাববে এসব আমারই কারসাজি। সৎমা বলেই আমি এদের সংসার ভাঙতে তোকে লাগিয়েছি।' বড়বিবি পান আর কথাগুলো যেন একসঙ্গে চিবিয়ে পিকদানে পিক ফেললেন।

'এখন আমি কি করব? ঘরে বসে থাকলে আমার খোরাক কোত্থেকে আসবে? আপনার কথাতেই তো আমি বড় মিয়ার কাছে গিয়েছিলাম। এখন আপনি আশ্রয় না দিলে আমি কোথায় যাই?' মর্জিনা গা থেকে বোরখাটা খুলে ভাঁজ করে কাঁধে রাখল। মেয়েটি কালো হলেও বেশ লম্বা। পিঠে দীর্ঘ বেণী। মাথার চুল কোঁকড়ানো। হাঁসের মত লম্বা গলা। গলায় রূপোর হার। কানেও রূপোর অলংকার। বুক দুটি ঠেলে উঠে তার স্বাস্থ্য ও সুঠাম শরীরের জানান দিচ্ছে। কালোর মধ্যে মর্জিনা যে বেশ সুন্দরী তা বোঝা যায়। 'আপনার কাজ করলেও আমি তৈমুর মিয়ার কাছ থেকে মাসে মাসে বেতন নিতাম। ইসমাইল আমাকে মেরে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আপনি তো বোঝেন আমার পক্ষে আর তার কিংবা জানু বিবির কাছে গিয়ে হাত

পাতা সম্ভব নয়। তাহ্‌লে তারা আমার চুল কেটে মুখে কালী মাখিয়ে বের করে দেবে। এ অবস্থায় আপনি যদি আমাকে না বাঁচান বড়মা, তাহলে ফাঁসী লটকিয়ে মরব। ইসমাইল মহল্লার লোকদের জানায়নি বলে আমি এখনও মৌড়াইল গাঁয়ে আছি। জানাজানি হলে পাড়ার মাতবররা আমাকে দেশছাড়া না করে ছাড়বে?'

'ইসমাইল এ ব্যাপারে আর লোক জানাজানি করবে না। কারণ শওকত তার মালিকের ছেলে। তোর সাথে শওকতের নামও জড়িত। সে চুপ করেই থাকবে।' আবার পিকদানে পিক ফেললেন বড় বিবি, 'আমি তোকে এখন কিভাবে পুষবো? তুই বরং চেষ্টা কর তোর সাথে শওকতের সম্পর্কটা যেন আলগা হয়ে না যায়। যদি লুকিয়ে-চুরিয়ে ছেলেটিকে ফাঁসাতে পারিস, তবে জানবি তুই বাদশাহ্‌জাদীর কপাল নিয়ে জন্মেছিস। আমি এখন তোকে এক মাসের বেতন যা তৈমুর মিয়ার কাছে পেতিস তাই দিচ্ছি। এই নিয়েই লুকিয়ে চলে যা।'

বলেই বড় বিবি বালিশের তলা থেকে একটা খুতি হাতড়ে পাঁচটি রূপোর টাকা বের করে মর্জিনার হাতে দিলেন। মর্জিনা টাকাগুলো কোমরে গুঁজে সাবধানে বোরখায় গা ঢেকে অন্ধকারে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়িতে নেমে গেল।

এ রাতে একই সময়ে খাটের ওপর অন্ধকারে মুখোমুখি বসে কথা বলছিল তৈমুর ও জাহানারা। ঘরে একটা হারিকেন থাকলেও সেটা প্রায় নিভু নিভু। জাহানারা বলল, 'তুমি বরং আর দেরী না করে শওকতের জন্য উপযুক্ত ঘরে একটা বউ খুঁজে বের কর মাহমুদের আব্বা। ইসমাইল ভাই ঠিকই বলেছে। আমার বাপের সংসারের তলিয়ে যাওয়া তুমি ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এখন দেখো এদের সংসারী করার জন্য কিছু করতে পারো কিনা। সংসার আর বউ ছেলেমেয়ে থাকলে কে জানে হয়ত সব হারিয়েও এরা টিকে থাকবে। আর যদি পেছনের কোনো টান না থাকে, তবে স্রোতের তোড়ে যেখানে খুশী ভেসে যাবে। সরোর আশা আমি এক রকম ছেড়েই দিয়েছি। এখন দেখো বাকী দু'টিকে বাঁচানো যায় কিনা।'

'সারোয়ারের ব্যাপারে তুমি খুবই হতাশ, আমি জানি। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো, তোমার ভাইদের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে বুঝদার। খারাপ পাড়ায় পড়ে থাকাটা তোমাদের পরিবারের কোনো নতুন পাপ নয়। এটা এ বংশের আদি পাপ। সবাই জানে এ দোষ আমার শ্বশুরেরও ছিল। তবুও তাকে এদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা করত। ভয়ও পেত। কারণ তার বিষয়বুদ্ধি ছিল। তিনি

নিজের চেষ্টায় এদেশের একজন ধনী মানুষ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাজারগুলোসহ সবগুলো মহল্লার বিচারক ছিলেন তিনি। তার কাছে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সুবিচারের জন্য ছুটে আসত। তিনি ইনসাফ করতে জানতেন বলেই আল্লাহ্ তাকে দু'হাতে দৌলতও দিয়েছিলেন। আবার বুদ্ধি ও বিবেকেরও কমতি ছিল না। তিনি বিয়ে করলেও ঘরে কসবী তুলেননি। তাদের কাছ থেকে হয়ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধেও নিয়ে থাকবেন। এতদঞ্চলের নিন্দুকদের মুখে আমি আজীবন একথাই শুনে এসেছি। কিন্তু আমার এতে বিশ্বাস জন্মায়নি। কারণ আমি নিজে তো দেখেছি কায়কারবারে আমার চাচা কী অমানুষিক পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতেন। এটাও অস্বীকার করা যাবে না, তার কতগুলো খারাপ নেশা ছিল। সারোয়ারের ব্যাপারেও আমার আশা, সে এখন যেমন ছেলেমানুষী করছে- তেমন অবস্থা চিরকাল থাকবে না। আমার তো মনে হয়, সেই একদিন আমার চাচার বিষয়-সম্পত্তির হাল ধরবে।' তৈমুর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিছানায় কাত হয়ে শিথানের জোড়া বালিশে মাথা রাখল।

জাহানারা বলল, 'যা-ই ঘটুক এসব নিয়ে আমি আর চিন্তা করতে চাই না। চিন্তা করে কি হবে? তবে শওকতের বিষয়ে যা জানলে এতে আর বসে থাকা যায় না। যত তাড়াতাড়ি পার তার বিয়ে দিয়ে আমাকে ভারমুক্ত কর। অন্তত আমার ভাইদের হেঁসেল ঠেলার জন্য একজন নিজের মানুষ ঘরে থাকলে হয়তবা আমি নিজের বাড়িঘরে ফেরার একটা উসিলা বের করতে পারব। তখন কেউ বলবে না, ভাইদের সম্পত্তি লুটেপুটে খেয়ে আমি ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছি।'

'মর্জি মেয়েটার খোঁজ-খবর নিয়েছিলে?'

'না। আমি বুঝি ঐ বড় বিবির বান্দীটার খোঁজ করতে যাব, যে কিনা আমার বোকা বদমাশ ভাইটার সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে গোলাঘরে ধরা পড়েছে! তুমি আমাকে কি ভাবো বলতো?'

'এখানে ভাবাভাবির কিছু নেই মাহমুদের মা। মর্জিনার অত সাহস হবে না যে শওকতের দিকে হাত বাড়ায়। আমার তো সন্দেহ হয় শওকতের পেছনে ঐ সোমত্ত জোয়ান মেয়েটিকে কেউ লেলিয়ে দিয়েছে। শওকতের এখন ভালোমন্দ যাচাই করার বয়েস নয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কিন্তু আছে। মর্জি এ মাসের পাওনা নিতেও আমার কাছে আসেনি বা কাউকে পাঠায়নি। মেয়েটার ব্যাপারে তোমার একটু সতর্ক থাকা উচিত। এ গাঁয়েরই তো মেয়ে। একটু নজর রেখ। আর আমিও শওকতের সম্বন্ধ দেখছি। সমান ঘর, সমান বংশ মর্যাদাটুকু তো অন্তত পেতে হবে?'

তৈমুর অন্যদিকে পাশ ফিরতে গিয়ে স্ত্রীকে সাবধান করল। এখন রাত

একটা। তৈমুরেরও প্রবল ঘুম পেয়েছে।

জাহানারাও স্বামীর পাশের বালিশে মাথা রাখতে গিয়ে অলস হাই তুলে বলল, 'সর্বনাশ, এটা তো আমার মাথায় আসেনি। মর্জিনা বড় আম্মার পেয়ারের কাজের মেয়ে। বেশ কয়েক বছর ধরে তার খেদমতে আছে। কে জানে কোন মতলবে মেয়েটিকে শওকতের পেছনে লাগানো হয়েছে। তবে এটাও জেনো...' জাহানারা স্বামীকে নিজের দিকে ফেরানোর জন্য বাহু ধরে টান দিল, 'যদি বড় বিবি বা এ বাড়ির কেউ এর পেছনে থেকে থাকে তবে কাউকে ছাড়ব না।'

'কি করবে?'

'আমার ভাইদের কেউ সর্বনাশ করবে আর আমি বুঝি চুপ করে থাকব?'

'তা যে থাকবে না সেটা কি আমি জানি না ভেবেছ? প্রশ্ন হল, করবেটা কি?'

'দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলব। সংসার, সম্পত্তি, দোকানপাট ভাগবাটোয়ারা করে সবার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলব। উঠোনে দেয়াল তুলে সৎ মাদের সাথে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেব। তুমি আমাকে চেনো না? আমি বাদশা মোল্লার মেয়ে!'

'তাই বুঝি', বেশ শব্দ করে হাসল তৈমুর, 'তোমার সৎ মায়েরাও তো এটাই চাইছে। সম্পত্তি ও দোকানপাটের ভাগবাটোয়ারা। এই ভাগাভাগিটা যাতে এই মুহূর্তে না হয় সেটারই ব্যবস্থা করে গেছেন তোমার আব্বার বন্ধুরা। এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বীরাও। ফাদার জোনস্, নন্দ কাকা, বিহারী বাবু, বংশী মাষ্টার আর শহরের আড়তদাররা। তারা এই মুহূর্তে বাদশা মোল্লার ব্যবসাপত্র গুটিয়ে দিয়ে নগদ পয়সার হরিরলুট চান না বলেই তোমার সৎ মায়েরা এ ব্যবস্থায় দারুণ অসন্তুষ্ট। এখন যদি তুমিই এটা করে দাও, তাহলে তো তাদের খুশীর আর সীমাই থাকবে না। তোমার বোন জামাই আমজাদ মিয়াও তাদেরই দলে, এটা ভুলে যেও না।'

'তাহলে তুমি এ অবস্থায় কি করতে বল?'

'মর্জিনা মেয়েটির ওপর নজর রাখতে হবে। আমার তো মনে হয়, তাড়িয়ে দিলেও হারামজাদীর সাথে তোমার বড় আম্মাজানের সম্পর্ক আছে। হয়ত লেনদেনও আছে। শওকত মর্জির সাথে কতটা অগ্রসর হয়েছিল তা একটা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে বোঝা যাবে না। ধর মর্জি যদি বলে তার পেটে বাদশা মোল্লার নাতি বা নাতনী আছে, তখন কি করবে?'

জাহানারা আর ধৈর্য রাখতে না পেরে স্বামীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সটান বিছানায় উঠে বসল, 'কি বলতে চাও তুমি? তোমারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। শওকত ক'দিনের ছেলে? এখনও নাকে টিপ দিলে দুধ বেরিয়ে আসবে। তুমি আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে এই ধারণা কর মাহমুদের আব্বা?'

'এটা ধারণা না জানু, ভয়। আমি ভয় পাচ্ছি। জানো তো তোমার বড় আম্মাজান কি করতে পারেন? তেমন দুর্ভাগ্য যদি তোমার ভাই শওকতের কপালে থাকে, সে ব্যাপারে তোমাকে সজাগ থাকতে বলছি মাত্র। আমি কোনো অগ্রিম আন্দাজের কারবার করি না। তবে তোমার মা কতদূর নিচে নামতে পারেন তা তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি। সজাগ থাকার জন্যই তোমাকে এসব বললাম। বিছানায় বসে থেকে দুশ্চিন্তায় কিছু এগোবে না। শুয়ে পড়।'

তৈমুর আবার স্ত্রীকে নিজের দিকে টেনে এনে বালিশে শুইয়ে দিল।

১৬

আজ খৃস্টান মিশন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরুবে। এটা ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিন। এই পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে মাহমুদ চিরকালের জন্য মিশন স্কুল ছেড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোনো হাইস্কুলে ভর্তি হবে। সেখানে শৈশবের শিক্ষক ফাদার জোনসের মত দয়ালু মানুষ হয়তো আর মিলবে না। থাকবে না কৃষ্ণা ঘোষ কিংবা মারিয়া কুকারের মত মেধাবী প্রতিদ্বন্দ্বীরা। মিশন এলাকার গীর্জার নীচে বসে গল্পের বই পড়ার রোমাঞ্চকর দিনগুলো আর হয়তো ফিরে পাওয়া যাবে না। তবুও নতুন পরিবেশে নতুন বন্ধু-বান্ধব ও অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই মাহমুদের জন্য অপেক্ষা করছে। এসব চিন্তা করতে করতে মাহমুদ ভোর ছটায় বিছানায় উঠে বসল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলোর আভা এসে ঢুকেছে ঘরে। বড় দরজাটা একটু ফাঁক। সকাল সাড়ে পাঁচটায় তালেবে এলেম ছেলেটা তাকে জাগিয়ে দিয়ে ফজরের নামাযের আযান দিতে সেই যে বেরিয়ে গেছে এখনও ফেরেনি। যাওয়ার সময় বলে গেছে, 'এই যে মাহমুদ মিয়া, ওঠো। আজ তোমার না ফল বেরুবে বলেছিলে? উঠে যাও, আমি মসজিদে গেলাম।'

ছেলেটা চলে গেলে মাহমুদ তাদে বিশাল ঘরের এ তীর থেকে ও তীর পর্যন্ত আবছা আলোর মধ্যে কাঠের বিম গুলোর দিকে তাকিয়ে এলোমেলোভাবে নানা কথা চিন্তা করছিল। এর মধ্যে তালেবেএলেম ছেলেটার আযান শুনল মাহমুদ। গলায় জোর আছে ওর। ও যখন আযান হাঁকে, মাহমুদ লক্ষ্য করেছে, এ বাড়ির ছেলে-বুড়ো সকলেই কান পেতে আযানের কথাগুলো শোনে। কেমন যেন

একটা আলাদা মধুরতা আছে ওর আযানের ভঙ্গীতে।

কিন্তু মাহমুদের এ মুহূর্তে উঠতে ইচ্ছে হল না। মনে হল সাড়ে সাতটায় স্কুলের ঘন্টা বাজবে। হয়তো এরও আধঘন্টা পর ফাদার জোনস্ ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা প্রোগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে ক্লাসে ঢুকবেন। এত তাড়া নেই তার ফল নিয়ে সে ভাবে না। জানে, পরীক্ষা তার বেশ ভালোই হয়েছে। যদি কৃষ্ণা বা মারিয়াকে পেছনে ঠেলে সে প্রথম হতে পারে তবে তো খুশীর সীমাই থাকবে না। না পারলেও ক্ষতি নেই। তৃতীয় স্থান তো তার জন্য থাকবেই। তবে সে এবার মনে মনে একটু বেশীই আশা করে। এতদিন কেবল অংকের জন্যই মাহমুদ ঘোষপাড়ার বংশী মাস্টারের মেয়ে কৃষ্ণার সাথে পেরে ওঠেনি। মেয়েটার পাটিগণিতের মাথা একেবারে ছেলেদের মত। একশ'র মধ্যে অংকে একশ'ই কৃষ্ণা বাগিয়ে নিয়েছে। আর মারিয়ার মাতৃভাষা ইংরেজী হওয়ায় সে স্বাভাবিক পারদর্শিতায় ইংরেজীতে ভাল করে। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টো বিষয়কে যেন এতদিন অধিকার করেই রেখেছিল। কিন্তু এবার অংক ও ইংরেজী পরীক্ষা দিয়ে এসে মাহমুদ তার আম্মার কানে কানে বলেছে, 'দেখো এবার আমিই ফার্স্ট হবো। অংক সবগুলো কারেক্ট হয়েছে। ইংরেজী ব্যাকরণেও এবার ভুল লিখে আসিনি বলে মনে হয়।'

জাহানারা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে একেবারে আত্মহারা হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি বলছিস?'

'মনে তো হয় এবার আমিই প্রথম হবো। ভূগোলও ভালো হয়েছে, ইতিহাসও ভালোই লিখেছি।' ছেলে মা'র দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, 'তবুও আব্বাকে এখনই কিছু আবার বলতে যেও না। আগে রেজাল্ট আসতে দাও, বলা তো যায় না। আমি যেমন ভাবছি, রেজাল্ট যদি সত্যি তেমন না হয়?'

'তাতে কি, এমন সুখবর আমি তোর আব্বাকে না জানিয়ে পেটে রাখতে পারবো বুঝি ভেবেছিস?'

মা ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে তার চুলে মুখ ঘষতে লেগেছিল।

সেই সুখ স্মৃতিই মাহমুদকে বিছানা ছাড়তে দিচ্ছে না। সে বালিশ আঁকড়ে হাসি মুখে বিছানায় শুয়ে আছে।

এর মধ্যেই পাখির ডাকে বাড়ির আঙিনাটা যেন ভরে যেতে লাগল। খোয়াড়ে মোরগ দু'টি পালা করে বাঁক দিচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে হাঁসের চৈ চৈ। সব কিছু ছাপিয়ে দোয়েলের ডাকটা কানে যেতেই মাহমুদ আর শুয়ে থাকতে পারল না। সে বিছানায় উঠে আড়মোড়া ভেঙে ভাবল, নাহ্ আর শুয়ে থাকা যায়

না, এখন ছ'টা বাজছে। দোয়েলটাই মাহমুদের ঘড়ি। প্রতিদিন ভোর ছ'টায় দোয়েলটা বাড়ির নিমগাছের একটা বাড়তি শুকনো ডালে বসে সুন্দর শিস তুলে ডাকে। পাখিটার সময়-জ্ঞানের একটুকুও হেরফের হয় না। মাহমুদ দেখেছে, সে দুয়ার মেলে বাইরে এলেই পাখিটা উড়ে যায়। মনে হয় দুয়ার মেলার শব্দটাকে দোয়েলটা ভয় পায় কিংবা তাদের বিশাল ঘরটার এমন একটা বিশাল দরজা খুলে যাওয়ার ফলে ঘরের ভেতরকার অন্ধকার দেখে দোয়েলটা বুঝি অবাক হয়ে উড়ে যায়।

মাহমুদ বিছানা ছেড়ে ফাঁক হয়ে থাকা দুয়ারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই দরজায় আম্মার হাতের কড়া নাড়া টের পেল।

'এখনও ঘুম থেকেই জাগিসনি বুঝি? ওরে তোর না আজ রেজাল্ট।'

মায়ের ডাক শুনেই মাহমুদ তাড়াতাড়ি দরজার সামনে গিয়ে মাকে কদমবুসী করল, 'আমি তো জেগেই ছিলাম। এক্ষুণি তৈরী হয়ে আসছি। তুমি খোয়াড় খুলে দাও। আর আমাকে বিদেয় করে দিয়ে কোহিনুরকে সাথে করে ওবাড়িতে নিয়ে যেও।'

মাহমুদ মাথা তুলে দেখল মায়ের পেছনে ওবাড়ির ইসমাইল মামার মেয়ে লতিফার হাতে সকালের নাস্তার ট্রে। মাহমুদ এক দৌড়ে বাড়ির গেট পেরিয়ে সামনের পুকুরে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল। পানিতে ছেলের এই সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণটা জাহানারা জানে। ছেলে শীতে পুকুরের কুয়াশা-ওড়া পানিতে ধীরে ধীরে নামতে ভয় পায়। হিমশীতল পানির ভয়। এ জন্যই সহসা ঝাঁপিয়ে পড়া। এতে নাকি শীতটা কম লাগে। পাগল ছেলে!

একটু পরেই মাহমুদ ভেজা প্যান্টসহ টির টির করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে ঢুকল। জাহানারা তাড়াতাড়ি আলনা থেকে তোয়ালে এনে ছেলের মাথা, বুক ও পিঠ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আজ কি পরে ফল আনতে যাবি? ব্লেজার পরবি?'

'না, সাদা পুলওভারটা আর সাদা প্যান্ট শার্ট, সাদা কেডস্ পরব। আজ সব দুধের মত সাদা পরব আম্মা।'

খুশী ছলকে যাচ্ছে ছেলের কথায়। জাহানারাও আনন্দে আটখানা হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়বে।

'দেখিস তুই-ই এবার প্রথম হবি, আমার মন বলছে।'

'তুমি আমার সাথে চলো না?'

'আমার সত্যি যাওয়ারই ইচ্ছে ছিল। কতদিন মিশনে যাই না। কিন্তু তোর বাপ এখনও দোকানে যায়নি। তাছাড়া আজ একটু পরে কে জানি আসবে তোর

আব্বার কাছে। বললাম তো আমার মন বলছে তুই-ই প্রথম হবি।'

চিরুণী দিয়ে সিঁথি ভাগ করে দিল ছেলের, জাহানারা। লতিফার হাত থেকে ট্রে নামিয়ে জলচৌকিতে রাখল, 'নে এবার ভেজা প্যান্টটা বদলে তোয়ালে পরে নে।'

ছেলের বুকের পাটার দিকে তাকিয়ে জাহানারা দেখল ফরসা ধবধবে বুকের ছাতি বেশ পুরুষালী আয়তন নিয়ে যেন একটু প্রসারিত হয়ে উঠেছে। জাহানারা ছেলের বুকের দিকে মুখের একটু থুথু ছিটিয়ে দিয়ে বলল, 'মাশাআল্লাহ। এবার পোশাক পরে নাস্তা খেতে আয়।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদা পুলওভার, সাদা প্যান্ট ও সাদা কেডস্ পরে মাহমুদ মায়ের সামনে এসে বলল, এতো কিছু কিন্তু এখন খেতে পারবো না আম্মা। আসলে ভয় লাগছে।'

'ভয় কিসের? বললাম তো তুই-ই ফার্স্ট হবি, দেখিস।'

দ্রুত মায়ের পাশে বসে নাস্তা সেরে মাকে কদমবুসী করে বেরিয়ে পড়ল মাহমুদ। আজ হঠাৎ যেন জাহানারা ছেলের গোছগাছ দেখে কেমন চমকে গেছে। মাহমুদ বড় হয়ে যাচ্ছে- এটা সম্ভবত জাহানারার প্রথম নজরে এল। প্যান্ট পরার সময় হঠাৎ জাহানারার নিজের সন্তানের ভারী লম্বা শক্ত পেশীর দিকে চোখ পড়ায় সারা মনে মাতৃসুলভ আনন্দানুভূতির বিদ্যুৎ যেন খেলে গেল। এই তো সেদিনও মায়ের আঁচল ধরে থাকত যে লাজুক শিশুটি, কখন সে এমন নিজের নিয়মে পাল্টে গিয়ে দৃষ্টান্তের মত মজবুত হয়ে উঠেছে।

'ফি আমানিল্লাহ্।'

জাহানারা মনে মনে নিজের ছেলের জন্য আল্লাহ্‌র দরগাহে দোয়া মাংলো। তার স্নেহদৃষ্টি মাহমুদের যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থেকে শেষে উদাস হয়ে গেল।

ফাদার জোনস্ ক্লাসে ঢুকতেই ছেলেমেয়েরা উঠে দাঁড়াল। সকলের উৎকণ্ঠার দিকে একবার ঘাড় কাত করে দেখলেন ফাদার। মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। তিনি মঞ্চের ওপর তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন। হাতে পরীক্ষার রেজাল্টের তালিকা ও প্রোগ্রেস রিপোর্টের ফাইল। দৃষ্টি উদাসীন। তার সামনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা। এদের তিনি প্রাইমারী ক্লাস থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত কেবল পাঠ্য বিষয়েই শিক্ষাদান করেননি, আদব-কায়দাও শিখিয়েছেন। স্বাস্থ্য, পোশাক-আশাকের ব্যাপারে সচেতন করে তুলেছেন। তিনি

একজন খৃস্টান পুরোহিত শ্রেণীর লোক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মের ছেলেমেয়েদের ওপর তার ধর্মের প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেননি। তবে যীশু খৃস্টের মাহাত্ম সম্বন্ধে মাঝে মধ্যে খৃষ্টানদের কোনো পরবের সময় বক্তৃতা করেছেন। যেমন বড়দিনের অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরই ডেকে কিছু না কিছু উপহার দিয়েছেন। তারাও ফাদারকে শিক্ষক হিসেবে এতদিন পিতার সম্মানই দিয়ে এসেছে। গত ছ'টি বছর এই ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তেমন কোনো অবাধ্যতার পরিচয় দেয়নি।

আজ তাদের এই শ্রেণীকক্ষে বসার কিংবা এ মিশন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে সম্পর্ক রাখার শেষ দিন। কারণ, স্কুলটি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্তই। যারা আজ সপ্তম শ্রেণীতে উঠবে, তারা চলে যাবে শহরের অন্যান্য বড় স্কুলে। যেমন অন্নদা, এডোয়ার্ড, জর্জ ফিফথ্ অথবা সরোজিনী হাইস্কুলে। ফাদারের সাথে আজই তাদের সম্পর্ক শেষ। সাধারণত ফাদার জোনসের স্কুলে কেউ ফেল করে না। খারাপ বা অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের এমনভাবে বিশেষ যত্ন নেয়া হয় যে তারা কোনো না কোনোভাবে উৎরে যায়। যারা স্কুলের শৃঙ্খলা মানে না কিংবা সংশোধনের অযোগ্য তাদের স্কুলে রাখার নিয়ম নেই। তেমন ছাত্র-ছাত্রীর পিতামাতাকে ডেকে এনে অতিশয় বিনয়ের সাথে ফাদার অন্য কোনো পেশায় লাগিয়ে দিতে অনুরোধ করে তাদের বিদেয় করেন।

আজ উপস্থিত রেজাল্ট প্রার্থী কারোর মধ্যেই ফেল মারার ভয় না থাকলেও প্লেস ও সর্বমোট নম্বর নিয়ে টেনশন আছে। সবাই জানে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে কৃষ্ণা ঘোষই প্রথম হবে। কেবল কৌতূহল মাহমুদ ও মারিয়াকে নিয়ে। এদের মধ্যে কে দ্বিতীয় স্থান দখল করবে?

কৃষ্ণা ও মারিয়া ডান পাশের বেঞ্চে সেজেগুজে বসে আছে। আর পাশের অর্থাৎ বাঁ দিকের সারিতে সাদা পুলওভার পরে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে মাহমুদ সামনের দিকে। এর মধ্যে সে একবারও মারিয়া কিংবা কৃষ্ণার দিকে তাকায়নি। তবে ক্লাসে ঢোকার সময় মারিয়ার মুখোমুখি পড়ে গেলে হাত উঁচু করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই মারী, এখান থেকে কোন স্কুলে যাবে?'

'ঠিক জানি না। ফাদার যেখানে বলেন। তুমি?'

'অন্নদা হাই স্কুল।'

'কৃষ্ণা বলছে সে সরোজিনীতে ভর্তি হবে না। কুমিল্লা চলে যাবে। সেখানে তার কাকা ল'ইয়ার। এতটুকুই আজ সহপাঠীদের সাথে কথাবার্তা। মাহমুদ অন্য পাশে সরে যাচ্ছে দেখে মারিয়া আবার তাকে ডাকল, 'এই শোন।'

মাহমুদ দাঁড়াল।

'তোমাকে পুলোভারে খুব মানিয়েছে, মনে হচ্ছে ফার্স্ট বয়।'

'ঠাট্টা করছ?'

'একদম না। বিশ্বাস না হলে কৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। ঐ তো কৃষ্ণা আগেই গিয়ে বেঞ্চের প্রথম জায়গাটা বিড়ালের মত দখল করে বসে আছে। কেমন টকটকে লাল ফ্রক পরেছে। একবার চেয়ে দেখো না।' হাসল মারিয়া।

মাহমুদ দেখল ফিরে গিয়ে লাইব্রেরী ঘর থেকে ফাদার আরও কিছু কাগজপত্র নিয়ে এ দিকেই আসছেন। সে আর কোনো কথা না বলে সোজা গিয়ে নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে পড়ল। কৃষ্ণার দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়েই সে চোখ নামিয়ে নিল। কৃষ্ণা দেখতে শ্যামলা হলেও এমনিতে খুব সুন্দরী। লাল ফ্রক, চুলে লাল ফিতে এবং পায়ে হিল-উঁচু সাদা জুতোতে তাকে অপরূপ লাগছে। তার চেহারায় সব সময় যেমন একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ লেগে থাকে, আজও তেমনি আছে কি-না তা দেখার সাহস হল না মাহমুদের। কৃষ্ণা জানে কৃষ্ণাই প্রথম হবে। মাহমুদ পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠার কালে থার্ড হয়েছিল। কৃষ্ণাই সব সময় প্রথম হয়। মারিয়া চতুর্থ স্থান ও পঞ্চমের মধ্যে ওঠানামা করে এ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। মারিয়া অবশ্য প্লেস নিয়ে ভাবে না। তার মেধার ধারণাই অন্য রকম। সে ভাবে, ভালো ছাত্র ও মেধাবী মানুষ প্লেস না পেয়েও নাকি হওয়া যায়। সে জোর দেয় নানা অপাঠ্য বিষয়ে জানার ওপর। মারিয়ার বিষয়ে এ স্কুলের সকলেরই ধারণা, মারিয়া তার সাদা চামড়ার দৌলতেই অনেক বড় চাকরি পেয়ে যাবে। তার আবার অত লেখাপড়া করার কি দরকার?

এ সময় ফাদার জোনস্ মঞ্চের সামনের দিকটায় এগিয়ে এলেন। কতক্ষণ একদৃষ্টে সকলের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন, 'রেজাল্ট তোমাদের খুব ভালো হয়েছে ছেলেমেয়েরা। ফার্স্ট-সেকেন্ড কিংবা প্লেসের জন্য তোমরা অনুতাপ করো না। সামগ্রিকভাবে এ ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাফল্যে আমি খুশী। পরিশ্রম এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকলে নিচে থেকে একবার একজন ছাত্র ওপরে উঠে আসে আবার কেউ মেধার জোরে তাকেও ডিঙ্গিয়ে আরও ওপরে চলে যেতে পারে। মনে রেখ, কোনো পরীক্ষাই শেষ পরীক্ষা নয়। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির পরও মানুষের জীবনে পরীক্ষা চলতে থাকে। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় প্লেস পাওয়াটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হল মানুষ হিসেবে এ পৃথিবীতে সাফল্য লাভ করা। আজ রেজাল্ট জানানোর আগে তোমাদের প্রতি আমার শেষ কথা হল, 'নো

রিপেনটেন্স। কোনো অনুতাপ থাকবে না এবং বি কাইন্ড। তোমরা মানুষের প্রতি দয়ালু হবে।'

ফাদার কথাগুলো বলে একটু থামলেন। তার চোখ এখন কৃষ্ণার ওপর। ফাদারকে এভাবে একদৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মাহমুদের হৃদপিন্ডের ভেতর কি যেন একটা ধক করে উঠল। না, সে বোধহয় এবারও কৃষ্ণাকে হারাতে পারল না। মাহমুদ মাথা নুইয়ে নখ খুটতে লাগল।

ফাদার ডাকলেন, 'শ্রীমতি কৃষ্ণা ঘোষ।'

'ইয়েস ফাদার।' কৃষ্ণা হাসি মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'মিস মারিয়া কুকার?'

'আয়ে'ম হিয়ার ফাদার।'

মারিয়াও যথারীতি উঠে দাঁড়ালো। কৃষ্ণার মুখে হাসির ঝলক থাকলেও মারিয়া হতভম্ব। সে কি করে দ্বিতীয় স্থান পাবে? দারুণ কৌতূহলের অস্বস্তিকর তরঙ্গ যেন বয়ে গেল ক্লাসের ভিতর। মাহমুদ আর মাথা তুলতে পারছে না। বুকটা ধুক ধুক করছে। এত ভালো পরীক্ষা দিয়েও সে থার্ড প্লেসেই আটকে থাকল? মাহমুদের কান দু'টি এক্ষুণি তার নাম ধরে ফাদারের আহ্বানের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকল। কিন্তু আশ্চর্য, ফাদার তার নাম ধরে আহ্বানের বদলে কৃষ্ণা ও মারিয়াকে মঞ্চে তার পাশে দাঁড়াতে আহ্বান করলেন।

কৃষ্ণা এক লাফে উঠে গেলেও মারিয়া একবার মাহমুদের অবনত মুখের দিকে না তাকিয়ে পারল না। কেমন যেন এলোমেলোভাবে পা ফেলে সে গিয়ে মঞ্চে দাঁড়াল। মারিয়া আজ একটা মোটা গরম কাপড়ের কালো স্কার্ট এবং পকেটে গোলাপ ফুলের নকশা আঁকা গাঢ় হলুদ রংয়ের ফ্লানেলের শার্ট পরেছে। তারও ছিল উঁচু জুতো এবং কালো মোজা। ফাদার দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে তাদের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা, এবার এদের দু'জনের রেজাল্ট বলছি। আমাদের কৃষ্ণা এবার সেকেন্ড হয়েছে আর মারিয়া থার্ড। আর এবারের পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব হল আমাদের আমির মাহমুদের। মাহমুদ এবার সব বিষয়ে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। সেই প্রথম। আমি তার খাতা অন্য দু'জনের সাথে মিলিয়ে এবার নিজেই অবাক হয়েছি। ফার্স্টবয় আমির মাহমুদকে আমার অভিনন্দন। মাহমুদ, মাই চাইল্ড, ওপরে উঠে এসো।'

এই অভাবনীয় আহবানে মাহমুদ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ দু'টো পানিতে ঝাঁপসা। সে এখন স্টেজের ওপর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

১৭

মাহমুদ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে খৃষ্টান মিশন স্কুলের লেখাপড়া থেকে বেরিয়ে আসার সংবাদে জাহানারা ও তৈমুরের আনন্দের সীমা রইল না। এখন সে অন্নদা স্কুলে ভর্তি হবার বায়না ধরল। যদিও তৈমুর চেয়েছিল ছেলে বাড়ির পাশে জর্জ ফিফথ হাইস্কুলে ভর্তি হলে পরিবারের সকলের চোখের সামনে থাকবে। কিন্তু ছেলের মনে পরিচিত পরিবেশের বাইরে যাওয়ার আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত জাহানারাই বলল, 'অন্নদা স্কুলেই ভর্তি করে দাও। আমাদের পাড়ায় মাহমুদের সমান বয়েসের ছেলেরা কে আর ওর মত স্কুলে যায়? সবাই তো দোকানদারের ছেলে। এ পাড়ার গৃহস্থরা লেখাপড়ার চেয়ে দোকানদারীকেই বড় মনে করে। এ পরিবেশের চেয়ে শহরের সরকারী কর্মচারী আর উকিল মোক্তারের ছেলেদের সাথে ঘোরাফেরা অনেক ভাল।'

জাহানারার ইচ্ছেটা বুঝতে তৈমুরের এক মুহূর্তও বিলম্ব হলো না। তৈমুর স্ত্রীর কথায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে চিন্তা করল।

'তাহলে আগামী মঙ্গলবার ওকে অন্নদা স্কুলেই ভর্তি করে দেব। তোমার ছেলেকে বলো আজ একবার দোকানে গিয়ে ফিরোজ মিয়ার কাছ থেকে কিছু নতুন জামা-কাপড় তার পছন্দ মত নিয়ে আসতে। হাইস্কুলে ভর্তি হলে এসব লাগবে। আমি গোমস্তাকে বলে রাখব।'

'তুমি পছন্দ করে কয়েকটা শার্ট-প্যান্ট নিয়ে এসো। জান তো তোমার ছেলের আত্মসম্মানবোধটা কেমন টনটনে। বলবে মামুদের দোকান থেকে মাগনা পোশাক আনতে কেন যাব? আমার কি জামা-কাপড় কম নাকি।'

জাহানারা হাসল।

তৈমুরও হাসল, 'তাহলে আমিই নিয়ে আসব। ওকে বলার দরকার নেই। এটুকু আত্মসম্মান থাকাটা আমিও চাই মাহমুদের মা।'

তখন ভোর বেলা। তৈমুর সকালের নাস্তা সেরে বেরুবার মুখে। জাহানারা বলল, 'আরেকটা কথা।'

'বল।'

জাহানারা এদিক সেদিক তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল, 'আজ মর্জিনার সাথে দেখা হবে। আমিই আমার সাথে দেখা করার জন্য খবর পাঠিয়েছিলাম।

ইসমাইল ভাইয়ের মেয়ে লতিফাকে পাঠিয়ে ওর খোঁজখবর নিতে চেয়েছিলাম। নিজেই নাকি বলেছে আমি জানুবিবির সাথে দেখা করতে ওনাদের পুরান বাড়িতে যাব। লতিফাকে বলেছে রাতে সে ঐ বাড়িতে আসবে। আমার সাথে অনেক কথা আছে।'

জাহানারার কথায় তৈমুর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে থমকে দাঁড়িয়ে জাহানারার দিকে কতক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল।

'কিছু তো বলবে! তোমার অনুমতি হলে তবে তো যাব। ভয় পাচ্ছি, না জানি হারামজাদী কোন দুঃসংবাদ শোনায়? আমার তো ভয় হচ্ছে তোমার সন্দেহটাই ঠিক। আমি গেলে না আবার খানকি মাগী নিজের পেট দেখিয়ে দেয়?'

'তবুও তোমাকে যেতে হবে। যদি তেমন ঘটনাই ঘটে থাকে তবে লোক জানাজানির আগেই সেটা সামাল দিতে হবে। তোমার ঘাবড়ে গেলে চলবে না জানু। মন শক্ত করে সব শুনবে কিন্তু নিজে কিছু বলবে না।'

'যদি অন্য কিছু বলে? ধরো নিজের দোষ কাটাবার জন্য শওকতের কথা বলে কিংবা মাসের বেতনটা চায়?'

'বেতন চাইবার ওর আর সাহস হবে কোত্থেকে? তবে তোমার এ কথা ঠিক মর্জি তোমার ভায়ের জোরাজুরির কথা বলতে পারে। বলতে পারে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বড় মিয়া জবরদস্তি করে ওকে ফাঁসিয়েছে।'

'তখন?'

'এ অবস্থায় তোমার কর্তব্য হবে মর্জিকে সান্ত্বনা দেওয়া। ও না চাইলেও ওর বেতনের টাকা দিয়ে দেওয়া। তাছাড়া মেয়েটিকে এখন ঘাটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা অবশ্য বলছি তোমার বড় মা'র এতে হাত আছে। কিন্তু যদি না থাকে? তোমার ভাই-ই যদি ওর ওপর জুলুম করে থাকে? তোমার ভাইটি যে ফেরেস্তা নয় সেটা তো জানো। সেক্ষেত্রে মর্জির মুখ বন্ধ করতে যত টাকা লাগে তোমাকে দিতে হবে জানু।'

তৈমুর এমনভাবে ঘটনার সম্ভাব্যতা বুঝিয়ে দিল জাহানারা নিস্তব্ধ। তৈমুর আবার একটু ভাবলেশহীন হাসি হাসল, 'আর যদি দেখা যায় তোমার বড় আম্মাই এর পেছনে আছেন তাহলে অর্থের জোরে হোক কিংবা গায়ের জোরেই হোক মর্জি মেয়েটাকে আমাদের বশ করতে হবে।'

এ কথা বলেই তৈমুর বেরিয়ে গেল।

আজ জাহানারা কোনো কিছুতে মন বসাতে পারল না। রান্না-বান্নার কাজ লতিফার ওপর ফেলে দিয়ে বেলা দশটার দিকে নিজের কামরায় এসে চুপচাপ

শুয়ে থাকল। লতিফা এসে ডাকলে বলে দিল, আজ রাধাঁ-বাড়া তুই-ই কর। আমার মাথা ধরেছে। দুপুরে দোকানে ভাত পাঠাবি। আর মাহমুদ এলে আমাকে ডেকে দিবি।'

'জি আচ্ছা।'

বলে লতিফা চলে গেলে জাহানারা দুয়ার এঁটে খাটে এসে শুয়ে পড়ল। এখন তার একটা চিন্তা, মর্জিনা মেয়েটা না জানি কি সংবাদ নিয়ে আসছে।

কোহিনূরকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে মাহমুদ ভাবল আজ কৃষ্ণাদের বাড়ি যাবে। সেই যে রেজাল্টের দিন মুখ গোমড়া করে কৃষ্ণা স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এরপর কৃষ্ণার সাথে আর দেখা নেই। মারিয়াও কয়েকদিন মর্নিং ওয়াকে বেরোয়নি। মাহমুদ ভাবল, মারিয়াকে সাথে করে সে আজ ঘোষপাড়ায় যাবে। মনে হয় কৃষ্ণার খুব অভিমান হয়েছে। ক্লাস থ্রি থেকেই কৃষ্ণা ছিল ক্লাসের প্রথম মেয়ে। সেকেন্ড প্লেস ছিল কান্দিপাড়ের দিলীপ বলে একটি ছেলের কিন্তু দিলীপ এবার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেনি। তার শরীরে বসন্তের গুটি ওঠায় সে এবার ড্রপ দিতে বাধ্য হয়েছে। যদিও জলবসন্ত। ছেলেটি অসুখ নিয়ে পরীক্ষা দিতে রাজি থাকলেও ফাদার জোনস্ তাকে নিবৃত্ত করেন। ফাদার নিজে তাকে বাড়ি গিয়ে তার সেবা করে আসতেন। দিলীপকে তিনি এমনিতে সপ্তম ক্লাসের জন্য প্রমোশন দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু কোন প্লেস দেননি। দিলীপদের পরিবার এতে সন্তুষ্ট। অসুবিধে হয়েছে কৃষ্ণাকে নিয়ে। কৃষ্ণা দারুণ অভিমানী মেয়ে। সে কিছুতেই মাহমুদের প্রথম হওয়াটা মানতে পারেনি। মাহমুদ শুনেছে কৃষ্ণা বাড়ি গিয়ে খুব নাকি কেঁদেছে। কৃষ্ণা ঘোষপাড়ার মাতবর বংশী মাস্টারের মেয়ে। এমনিতেই সে মেধাবী এবং অহংকারী। মোল্লাবাড়ির একটি ছেলে পরীক্ষায় তাকে পেছনে ফেলে প্রথম হবে এটা যেমন কৃষ্ণার আন্দাজের বাইরে ছিল তেমনি তার পরিবারেরও। বংশী মাস্টার নিজে নাকি ফাদারের কাছে গিয়ে কৃষ্ণা ও মাহমুদের খাতা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে এসেছেন, নাহ্ মোল্লাবাড়ির তৈমুর মিয়ার ছেলেটিই এবারের ফাইনালে খুব ভাল লিখেছে। এসব কথা মাহমুদের আব্বার কাছে ফাদার নিজেই নাকি বলেছেন। আব্বা-আম্মার কাছে এসব বললে মাহমুদ জানতে পেরে তখুনি ভেবেছে একবার কৃষ্ণার সাথে দেখা করে আসা উচিত। কিন্তু একাকী কৃষ্ণাদের বাড়ি যেতে তার মন চাইল না। ভাবল মারিয়াকে নিয়ে যাবে। এক সময় তো তিনজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনজন একত্র হলে হয়ত কৃষ্ণা মুখ বেজার করে থাকবে না। আবার আগের মতই

হাসি-ঠাট্টায় ভরে যাবে।

সেদিন রোববার হওয়াতে মাহমুদ ভাবল মারিয়াকে হয়ত তার হোস্টেলেই পাওয়া যাবে। মাহমুদ জানে, রোববার গীর্জা থেকে সকালে বেরিয়ে সোজা মারিয়া গিয়ে বাইবেল নিয়ে বসে। এমনিতে মেয়েটা অন্যান্য দিন বাগানে কাজ করে কিংবা রোদে আচার শুকোয় কিংবা দিদিমনিদের কাছে সেলাই-ফোঁড়াই অথবা লেস বোনার কাজ শেখে। কেবল রোববারটায় খৃস্টান পাড়ার লোকদের কোনো কাজ নেই।

মাহমুদকে মিশনের গেট পেরিয়ে গীর্জার সামনে আসতে দেখে, মারিয়া হাসতে হাসতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে, 'এই যে ফার্স্ট বয়! আমি তোমার খোঁজেই বেরুচ্ছিলাম। প্রোগ্রেস রিপোর্ট হাতে পেয়ে বুঝি আর এদিকটা মাড়াতে ইচ্ছে করে না?'

'তা কেন, আমি তো তোমার খোঁজেই এলাম।'

'সত্যি? আমার খোঁজে এসেছ না ফাদারের আদর খেতে হাউজে যাচ্ছিলে?'

'তোমার সাথে শুধু দেখা করতেই নয় তোমাকে নিতে এসেছি মিস্ কুকার!'

'কোথায়? তোমার মামু বাড়িতে?'

'না। তোমাকে নিয়ে আজ কৃষ্ণাকে দেখে আসি। বেচারা অভিমান করে আছে।'

'চমৎকার আইডিয়া! চলো।' মারিয়া এগিয়ে এসে মাহমুদের হাত ধরল, 'তুমি খুব ভাল, খুব উদার ছেলে। তোমার সাথে কৃষ্ণাদের বাড়ি যেতে আমি হ্যাপী হব।

মারিয়ার কথা বলার তাড়াতাড়িতে ভুল বাংলা বেরিয়ে আসায় মাহমুদ হাসল, 'হ্যাপী হব না, বলো তোমার সাথে কৃষ্ণাদের বাড়ি যেতে আমার ভালোই লাগবে।'

'হ্যাঁ ভালোই লাগবে। এখুনি চলো।'

জোরে হেসে ফেলল মারিয়া। মাহমুদও হাসল।

কৃষ্ণাদের বাড়ির সামনের পুকুরে একটা সোমত্ত মেয়ে ভেজা শরীরে ঘাটলায় উবু হয়ে কি যেন করছিল। মেয়েটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সেদিকে চোখ যেতেই মাহমুদ চোখ নামিয়ে নিল। কিন্তু মারিয়া অবাক, 'এটা কে? ও অমন নেকেড কেন?'

'ও কৃষ্ণার বোন। পাগল। ওদিকে তাকাতে নেই।'

'কেন তাকাতে নেই? কৃষ্ণার বোন এ্যাবনরমাল?'

'হ্যাঁ মিস কৃকার। শুনেছি ও জন্ম থেকেই এমন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছে। ওদের কি করার আছে? সারাদিন ও পুকুরটায় পড়ে থাকে। কাঁচা মাছ, গুগলি শামুক যা পায় তাই খায়। শীতকালেও গায়ে কাপড় রাখে না। বেঁধেও ঘরে রাখা যায় না। অগত্য ওর কথা এখন ওর পরিবার আর ভাবে না। মানুষ ওর দিকে তাকিয়ে মজা দেখে। চলো আমরা সামনে এগোই। অমন করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলে ওর বাড়ির লোকেরা খারাপ ভাববে।'

মারিয়াকে নিয়ে পুকুরটা দ্রুত পেরিয়ে যেতে চাইল মাহমুদ। কিন্তু মারিয়া নড়ল না। বরং র‍্যাপার টেনে ধরে বলল, 'দাঁড়াও, আমি দেখব। আচ্ছা কৃষ্ণারা ওর চিকিৎসা করায় না?'

'হয়ত ওরা অনেক চেষ্টা করেছে। ফল হয়নি। জন্ম পাগলী কি না!'

মাহমুদ ও মারিয়ার কথাবার্তায় পাগলীটা হঠাৎ মাথা তুলে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে সচকিত হয়ে একটা গোঙানির শব্দ তুলল। মনে হলো বাঘিনীর মত গড় গড় করে উঠেছে। এ সময় মেয়েটার সম্পূর্ণ দেহলতা মারিয়ার নজরে পড়ল, 'ওহ্ হাউ বিউটিফুল ফিগার।'

মাহমুদ চোখ তুলেই নামিয়ে নিল, 'ওভাবে তাকাতে নেই। দেখছো না ওর গায়ে কিছু নেই?'

'পাগলীটা কিন্তু কৃষ্ণার চেয়েও সুন্দরী! গায়ের রংটা কি মিষ্টি। আর শরীরটা কি নিখুঁত। ও গড!'

মারিয়ার আক্ষেপ ফুরাতেই সামনের বাড়ির গেট খুলে কে যেন বেরিয়ে এসে বলল, 'কে ওখানে?'

দেখা গেল কৃষ্ণা নিজেই বেরিয়ে এসে ঘাটলার ওপরে মাহমুদ ও মারিয়াকে দেখে একেবারে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, 'কি ব্যাপার, তোমরা কোত্থেকে এলে?'

মারিয়া হেসে বলল, 'মাহমুদ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। কৃষ্ণা ওকে হ্যালো বলো!'

কৃষ্ণার অপ্রসন্ন মুখে একটু হাসি ফুটল, 'বারে ভিতরে এসে বসবে তো।'

এ কথায় মারিয়া খুশী হয়ে কৃষ্ণাকে জড়িয়ে ধরল, 'আসলে আমরা তোমাদের বাড়িতে মাঠা খেতে এসেছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘোষদের বিখ্যাত মাঠা। খাওয়াবে না?'

কৃষ্ণা হেসে মাহমুদের দিকে মুখ তুলল, 'এসো মাহমুদ। তুমি এসেছো দেখলে আমার বাবা-মা খুব খুশী হবে। কৃতিত্বের জন্য আমার শুভেচ্ছা। কোথায় ভর্তি হচ্ছো?'

মাহমুদ গেটটা পার হতে হতে বলল, 'অন্নদা স্কুলে। তুমি তো কুমিল্লা চলে যাচ্ছ বলে জানলাম।'

'বাবা তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার মেজ কাকা আগরতলার ডাক্তার। তিনি বাবাকে লিখেছেন আমাকে সেখানেই নিয়ে যাবেন।'

জবাব দিল কৃষ্ণা।

সবাই কৃষ্ণাদের বারান্দায় এসে উঠলে কৃষ্ণার মা মাহমুদকে দেখে বারান্দায় বেরিয়ে হাসলেন, 'তুমিই তো মোল্লাবাড়ির জানুর ছেলে? তোমার নামই তো মাহমুদ?'

মাহমুদ বলল, 'জি, আপনি তো কতবার আমাদের বাড়ি গিয়েছেন। আমর নাম ভুলে গেছেন?' বলতে বলতে সে কৃষ্ণার মাকে কদমবুসী করতে উবু হলে তিনি মাহমুদকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বোলালেন, 'বেচে থাকো বাবা, তোমার নানার মত বড় মানুষ হও।'

মাসীমা তাদের মোড়া পেতে দিলেন।

মারিয়া বলল, 'আমরা আপনার বাড়ি আজ ঘোল খাব বলে এসেছি।'

মারিয়া এতক্ষণে আঞ্চলিক 'মাঠা' শব্দটিকে পাল্টে দিয়ে 'ঘোল' বলাতে মাহমুদ হাসল। মারিয়া বলল, 'হাসলে কেন?'

'হাসলাম কোথায়? দেখছি তুমি বাঙালীদের চেয়েও ভালো বাংলা শিখে যাচ্ছ।'

নিজের কৃতিত্বে মারিয়া নিজেই জোরে হেসে উঠল।

মাসীমা বললেন, 'তোমরা বসো, আমি দেখছি কার ঘরে এ সময় মাঠা পাওয়া যায়। মাঠা নিয়ে তো পাড়ার লোকেরা খুব ভোর বেলায় বেরিয়ে গেছে। তবুও আমি চেষ্টা করে দেখি, না পাওয়া গেলে দুপুরে একেবারে ভাত খেয়ে যাবে।'

মাসীমা চলে গেলে কৃষ্ণা বলল, 'তোমরা বসো আমি চা করে আনছি।'

কৃষ্ণা যেতে উদ্যত হলে মাহমুদ কৃষ্ণার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল, 'কৃষ্ণা।'

কৃষ্ণা অবাক হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের ওপর সরাসরি তাকাল।

'আমি এবার ফার্স্ট হওয়ার জন্য খুব খেটেছিলাম। তবুও কখনো ভাবতে পারিনি যে তোমার মত পড়ুয়া মেয়েকে হারাতে পারব। আমার ওপর রাগ করে থেকো না। তুমি আগরতলায় গিয়ে খুব ভালো করবে।'

খুব দরদ মিশিয়ে মাহমুদ কথাগুলো বলল।

কৃষ্ণা হেসে বলল, 'আমি একটুও রাগ করিনি। আমি যদি বুঝতাম তুমি আমাকে পেছনে ফেলার জন্য পণ করে খাটছো তাহলে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে

পারতে না। এখন আমার আর কোন রাগ নেই।'

কৃষ্ণা চা করতে ভেতরে চলে গেলে মারিয়া ফিসফিস করে মাহমুদের কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'যাই বলো পুকুর পাড়ে কৃষ্ণার বোনকে দেখে আমার মন খারাপ হয়ে আছে। ওকে ওরা ওভাবে ছেড়ে দিয়েছে কেন, 'একদম নেংটো? আচ্ছা ওকে কি নামে ডাকে?'

'ওর আসল নাম কি তাতো জানি না, তবে পাড়ার লোকেরা ওকে পাগলী বলে। কেউ বলে 'শামুক খাওড়ী।' ওর একটা নাম নিশ্চয় আছে। আমি জানি না।'

'ওর কথা আমি ফাদারকে বলব। আমার মনে হয় কি জানো, ও চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাবে। কেন যে কৃষ্ণারা ওকে এমনি ছেড়ে দিয়েছে?'

মারিয়ার আক্ষেপ শুনে মাহমুদ সঙ্গিনীর দিকে ফিরে তাকাল। মারিয়া বিদেশিনী হলেও তার হৃদয়টা কত ভাল। মাহমুদের খুব ভালো লাগল মারিয়া কুকারের ফর্সা দরদভরা মুখখানি।

১৮

আজ সন্ধ্যা বাতির সাথে সাথে জাহানারা একটা কালো চাদর জড়িয়ে হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার নিয়ে জর্জ স্কুলের সামনের পুকুরের দক্ষিণ পাড় ধরে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল। একটু আগে মোল্লাবাড়ির মসজিদে আযান হয়েছে। এর মধ্যেই নামাযীরা মাগরিব পড়ে বেরিয়ে আসছে দেখে জাহানারা দক্ষিণ পাড়ের পশ্চিম পাঠশালার আড়ালে নিজেকে লুকালো। পাড়ার মাতবর আবদুল কাদির মুন্সীকে সবাই ভয় পায়। যদি তার নজরে একবার কোনো মেয়ে একটা পড়ে যায়, তাও আবার মোল্লাবাড়ির কোনো বৌ বা মেয়ে তাহলে কেলেংকারী কান্ড হবে। মোল্লাবাড়ির মেয়ে সঙ্গে কাউকে না নিয়ে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাচ্ছে দেখলেই তিনি বাড়ি বয়ে গিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসবেন। এদের খবরদারিতেই এখনও মৌড়াইল গাঁয়ের শালীনতা ও শরাফতি টিকে আছে। জাহানারাও কাদির মুন্সীকে সম্মান করে। খুবই নেক বখত মানুষ। আব্বার মৃত্যুর পর জাহানারাদের ভালোমন্দের খোঁজ-খবর নিতে তিনি মাঝে মধ্যে তৈমুরের কাছে আসেন। তাকে সাহস দেন। জাহানারা ভাবল মুন্সী চাচা রাস্তাটা পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে ইস্কুলের পেছনে অপেক্ষা করবে।

এ সময় কোত্থেকে যেন কোহিনুরকে নিয়ে মাহমুদ এসে হাজির হল, 'আরে আম্মা, তুমি এখানে কি করছ?'

জাহানারা ফিরে মাহমুদকে দেখেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক বাবা তুই আসাতে ভালোই হল। আমি মাগরিব নামাযের মুসল্লীরা রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। এখন তোর সাথে যাওয়া যাবে। চল বাড়ি যাই।

মাহমুদ মাকে নিয়ে রাস্তায় উঠতেই একেবারে কাদির মুন্সীর সামনে পড়ে গেল। মাহমুদ তাড়াতাড়ি সালাম বলতেই ওয়ালেকুম বলে মুন্সী সাহেব দাঁড়ালেন। কে যায়?

'আমি চাচা, আমি জানু।'

'ও বাদশা মিয়ার মেয়ে! বাপের বাড়ি থেকে এলে?'

'জি চাচা।'

তোমার ভাই সারোয়ারকে সামলাও মা। আমি তৈমুরকেও বলেছি। বাদশা ভাইয়ের একটা ছেলে খারাপ পাড়ায় পড়ে থাকে এটা সহ্য হয় না। দরকার হয় গাঁয়ের পাঁচজন তোমাদের মদদ করবে। এ গাঁয়ের প্রতিটি পরিবার তোমার বাপের কাছে ঋণী। কতভাবে না তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করে গেছেন। তার পরিবারের কোনো নাফরমানী কাজ দেখলে বুকটা ভেঙে যায় মা। আজকাল মুরুব্বীদের ধমক কেউ আর শোনে না। কিন্তু তোমরা তো এ দেশের প্রথম ইসলাম প্রচারকদের বংশ। তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহম হোক, এ দোয়াই করি।'

কাদির মুন্সী কথাগুলো বলে এগিয়ে চলে গেলে জাহানারা মাহমুদের হাত ধরে বড় রাস্তার উপরই কতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কাদির মুন্সীর মত শরিয়তের ব্যাপারে কঠোর মানুষও বাদশা মোল্লার পরিবারের প্রতি কতটা সদয়, কতটা নরম। জাহানারা বুঝল গাঁয়ের মুরুব্বীরাও তার ভাইদের উচ্ছৃংখল জীবন দেখে ক্রুদ্ধ হওয়ার বদলে বরং সহানুভূতিশীল। সবাই চায় বাদশা মোল্লার পরিবারটি ধ্বংস হয়ে না যাক। অথচ তার নির্বোধ ভাইয়েরা যে যেদিকে ইচ্ছে ধ্বংসের দিকে নেমে যাচ্ছে। জাহানারা নিজের অজান্তেই মাহমুদের হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'চল যাই।'

ঘরে এসে জাহানারা নিজেই নিজের ঘর, আসবাবপত্র, উঠোন ইত্যাদি ঝাড় দিল। খোয়াড়ে হাঁস-মুরগী ঢুকিয়ে তালা দিল। মনে হল কতদিন পর সে যেন আপন সংসারে এসেছে, যদিও একদিন পর পরই সে বাড়ি এসে সব কিছু তদারক করে যায়।

আজ যেন কাদির মুন্সীর কথায় জাহানারার চমক ভেঙেছে। বাদশা মোল্লার

ছেলেরা না পারুক, সে তো আছে। সেও তো বাদশা মোল্লারই মেয়ে। যদি বাদশা মোল্লার ছেলেরা এ বংশের প্রাচীন গৌরব ধরে রাখতে না পারে তবে তার মেয়ে কি চেষ্টা করতে পারে না? কেন পারবে না, তারও তো মাহমুদের মত ছেলে আছে। মাহমুদ একদিন বিদ্বান হবে এ ব্যাপারে জাহানারার কোনো সন্দেহ নেই। এ বছরই ছেলে মিশন ইস্কুল থেকে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডিঙিয়ে প্রথম হয়ে বেরিয়ে এসেছে। উপযুক্ত শাসন ও সাহায্য পেলে মাহমুদ যে হাই ইস্কুলেও সবাইকে ডিঙিয়ে যাবে তা জাহানারা ও তৈমুরের ভালো করেই জানা। হয়তো এ জন্যই নিজের বাস্ত ভিটের ওপর জাহানারার যেন অসম্ভব মায়া বেড়ে গেছে।

জাহানারাও আজ দোয়েল পাখিটার ডাক কানভরে শুনল। টুনটুনিটার অবশ্য কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। কোহিনুরকে যথাস্থানে বেঁধে মাহমুদ বড় ঘরে বই নিয়ে বসেছে।

এশার নামায পড়িয়ে তালেবেএলেম ছেলেটা খাওয়া শেষ করে মসজিদ থেকে ফিরবে। ঘর-দোয়ারের কাজ শেষ করে জাহানারা এসে ছেলের পাশে বসল।

'তুমি বুঝি আজ এখানেই থাকবে?'

মাকে জিজ্ঞেস করল মাহমুদ।

'নারে, এখানে আজ থাকতে আসিনি। এসেছি অন্য একটা দরকারে। তুই আর তোর তালেবেএলেম দোস্ত আজ রাত ন'টা পর্যন্ত মসজিদের পাশে আমাদের বারবাড়ি ঘরে গিয়ে পড়া করে কাটাবি। গাঁয়ের একটি মেয়ে আজ গোপনে এখানে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। বিষয়টা কেউ যেন জানতে না পারে সে জন্য তোকে আগেই বলে সতর্ক করে রাখলাম। মেয়েটি চলে গেলে আমি তোদের এখানে ডেকে এনে ও বাড়ি যাবো।'

'কে আসবে আম্মা।'

'মর্জি। ও বাড়ির কাজের মেয়ে মর্জিনাকে চিনিস তো! ওই আমার কাছে ওর কিছু দুঃখের কথা বলতে আসবে। বিষয়টা আমাদের গোপন রাখা দরকার। তুই হারিকেনটা নিয়ে এখুনি বারবাড়ির ঘরে চলে যা। তোর দোস্তকে বলবি, আমার আম্মা জরুরী কাজে রাত ৯টা পর্যন্ত এখানে থাকবে। খাওয়ার সময় তুই এসে টিফিনে রাখা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়বি বুঝলি?'

'ঠিক আছে।'

মাহমুদ হারিকেন ও বইখাতা নিয়ে চলে গেল। পাঠ্যবই নয়। পাঠ্যবই ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পর কেনা হবে। একটা গল্পের বই। মাহমুদ এই ফাঁকে কয়েকদিন গল্পের বই পড়ে কাটাবার একটা সুযোগ পেয়েছে।

মাহমুদ চলে গেলে জাহানারা ছেলের পড়ার টেবিলটা গুছিয়ে দিয়ে একটা মোড়া এনে বারান্দায় বসল। ঝিঁঝি পোকার রবে বাড়িটা যেন ঝিম ধরে আছে। পেয়ারা গাছে একটা বাদুড় এসে বসাতে ডালপালা দুলছে। বেগুন খেতে ঝাঁক বেঁধে আলোর ফুলকি ছড়িয়ে দিচ্ছে জোনাকি। জাহানারা অপেক্ষা করছে কখন মর্জির মুখটা উঠোন পেরিয়ে এসে বারান্দায় তার মুখোমুখি হবে। কি বলতে চায় মর্জিনা? সে কি সত্যি এ কথাই বলতে আসছে, তার পেটে বড় মিয়ার ফরজন্দ আছে? একথা বললে জাহানারা কি করবে কিছুই স্থির করতে পারছে না। তৈমুরের সব সতর্ক উপদেশগুলো এখন তার মনের ভেতর যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। জাহানারা ভাবল এমন দুঃসংবাদ শুনলে সে প্রথমেই বান্দীর বাচ্চা মর্জির দু'গালে ঠাস করে আগে কয়েকটি চড় লাগাবে। তারপর দেখা যাবে কি হয়। তার ভাইয়ের না হয় অনেক দোষ। কিন্তু তুই কোথাকার সতী?

হঠাৎ জাহানারার ভাবনায় ছেদ পড়ল। একটা ছায়ামূর্তি সারা শরীর কালো কাপড়ের বোরখায় ঢেকে উঠোন পার হয়ে আসছে। জাহানারা মোড়া থেকে উঠল না। আগন্তুক উঠোন পার হয়ে সোজা এসে বারান্দায় জাহানারার মোড়ার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

আমি মর্জি, বড় বুবু।'

'জানি। আমার সাথে তোর কি কথা?'

সরাসরি প্রশ্ন করে ফেলল জাহানারা।

মর্জি সহসা কোনো জবাব দিতে পারল না।

'সারা জীবন আমাদের বাড়ির ভাত খেয়ে, আমার দেওয়া কাপড় পরে, আমার বাপ-মা'র সেবা করে তুই, তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী মানুষ হয়েছিস। বল আজ আমাদের কোন সর্বনাশ করতে তুই আমাকেই ডেকেছিস, বল আমি আজ শুনতেই এসেছি।'

জাহানারার গলা থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এল কর্তৃত্বের স্বর। এভাবে জাহানারা একটা চাকরানীকে ধমকে উঠতে পারে এটা এখন তৈমুর শুনলেও বিশ্বাস করত কিনা সন্দেহ। যদিও এ দেশের সবচেয়ে প্রতাপশালী মানুষের কন্যা সে। তবুও বাল্যের শিক্ষা যা সে ফাদার জোনসের ইস্কুলে পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষার গুণেই জাহানারা ছিল মোল্লাবাড়িতে সবচেয়ে নমনীয় এবং কমনীয় যুবতী। আজ যেন সকল সংস্কার ও শিক্ষার বাঁধ ভেঙে গেছে।

'আমার সৎমা'র খেদমতের জন্য আমি সারা বছর তোকে বেতন গুণি। ইসমাইল ভাইয়ের কাছে শুনলাম তুই আমারই ভাইয়ের সর্বনাশ করে সমাজে আমাদের হেয় করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিস। এখন বল তোর কি কথা আছে?

এ কথায় ছায়ামূর্তির আবৃত শরীর থেকে বোরখার আবরণ সরে গেল। মর্জি সোজাসুজি উবুড় হয়ে জাহানারার দু'পা জড়িয়ে ধরে তার হাঁটুতে মুখ ঘষতে ঘষতে বিলাপ জুড়ে দিয়ে বলল, 'আমার কোনো কথা নাই বড় বুজান। আমার দোষ আমি স্বীকার করবার জন্যই আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি। আপনার ভাইয়েরও কোনো দোষ নেই, আমিই বড় মিয়াকে নাপাক করেছি। আমি আপনার পা ছুঁয়ে তৌবা করতে এখানে এসেছি। আমি কিছু চাই না, আপনি আর বড় দুলাভাই আমাকে মাফ করে দিন। আমি আর এ গাঁয়ে থাকব না। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।'

গোঙিয়ে গোঙিয়ে এ কথাগুলো বলে মর্জিনা জাহানারার হাঁটুর ওপর মাথা চেপে বসে থাকল।

জাহানারা চুপ থেকে মর্জির এই অনুতাপ গ্রহণ করতে গিয়ে তার রাগও পড়ে গেল। এখন সহসা মনে পড়ল তৈমুরের উপদেশগুলো।

'মাথা তোল।'

জাহানারার গলা নরম হয়ে এল।

'আপনি মাফ না করলে আমি বিষ খাবো বড় বুজান।'

'আমরা তোকে মাফ করে দিতে পারি মর্জি, যদি তুই তোর এই ঘটনার পেছনে কে আছে তা বলিস।'

জাহানারা এবার সরাসারি ভিতরের কথাটা জানতে চাইছে।

'ও কথা জিজ্ঞেস করবেন না বুজান ও কথা আমি ভাঙতে পারব না। তাহলে সারা গায়ে লাঠালাঠি শুরু হবে। আমার পাপ আমিই তো কবুল করলাম। এখন আমাকে আপনাদের যা খুশী শাস্তি দিন। আমার চুল কেটে দশজনের সামনে মুখে চুনকালী মাখিয়ে গাঁ থেকে বের করে দিন। আমি গোনাগার, আমি জাহান্নামী...।

মর্জি আবার বিলাপ জুড়ে দিল।

'থাম মর্জি, আগে বল তোর পাপের ফল তোর পেটে আছে কি না। খোলাখুলি বলে দে। আমি জানতে চাই আমাদের কতটা সর্বনাশ সইতে হবে?'

এ প্রশ্নে হঠাৎ যেন মর্জি থমকে গেল। এবার সে আকাশের দিকে কি ভেবে যেন একবার তাকাল।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। আজ পূর্ণিমা। কোথাও কোনো মেঘের কুন্ডলী আকাশে দেখা যাচ্ছে না। জ্যোস্নার মধ্যে চামচিকেরা ঝাঁক বেঁধে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।'

'আমিও এই ভয়ই পেয়েছিলাম বুজান। আল্লাহ এই পাপীর ওপর রহম

করেছে। আজই আমার হায়েজ শুরু হয়েছে। এই ভয়েই আপনার সাথে দেখা করে বিপদের কথা আপনাকে জানিয়ে বিষ খাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ দুপুর থেকে নামতে শুরু করেছে... ।'

'আলহামদুলিল্লাহ, হে পরোয়ারদিগার তুমি আমার মরা বাপের মুখ বাঁচিয়েছ।'

জাহানারা তার কোমর থেকে একটা ছোট্ট খুতি বের করে খুলল, নে তোর বেতন। কাল থেকে বড় বিবি নয়, আমার এ বাড়িতে আমার বাড়িঘর আর ছেলেকে দেখা শোনা করবি।'

মর্জি এ কথায় কাঁপা কান্নার আওয়াজ তুলে জাহানারার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

১৯

মর্জিকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে জাহানারা তাকে নিজের বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে এল। পরের দিন ভোরে এসে মর্জি এবাড়ির ঝাড়পোছ করবে, হাঁস-মুরগীকে খুদকুড়ো দেবে এবং কোহিনুরেরও চরানোর ভার নেবে। এ বাড়িতেই থাকবে, নিজের জন্য রাঁধবে এবং জাহানারার অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবে না। আব্রু মেনে চলবে বলেও মর্জিনা জাহানারাকে প্রতিশ্রুতি দিল। কেবল একটা ব্যাপারেই মর্জির ভয় এখনো যায়নি। যদি ওবাড়ির বড়বিবি তার বাঁধা কাজের মেয়ে মর্জিকে এ বাড়িতে কাজ করতে দিতে আপত্তি জানায়? মর্জি তার ভয়ের কথা জাহানারাকে জানিয়েছে।

'আমি তো বুজান আপনার দয়ায় এ বাড়িতে সুখেই থাকব। কিন্তু আপনার বড় আম্মা যদি এ নিয়ে আপনার সাথে কথা বাড়ায়?'

'বাড়াবে না। তুই না ভাঙলেও আমি জানি, তুই বড় আম্মার কথাতেই আমার ভাইকে ফাঁসাতে চেয়েছিলি। তিনি যখন জানবেন তুই আমার এ বাড়িতে আছিস আর আমিই তোকে এখানে এনে কাজে বহাল করেছি, তখন বুঝতে বাকী থাকবে না আমরা, আমি আর মাহমুদের আব্বা তার ষড়যন্ত্রটা জেনে গেছি। তখন একদম চুপ মেরে যাবেন। তোকে ডেকে জিজ্ঞেস করারও সাহস তার হবে না।' হাসল জাহানারা, 'তবে খালি বাড়ি পেয়ে তার ভাইদের দিয়ে তোর ক্ষতির চেষ্টা করতে পারে। সজাগ থাকিস।'

এ কথায় মর্জিনা চমকে গেল, 'কি ক্ষতি করতে পারে বুজান?'

'যে ক্ষতি তোকে দিয়ে আমার বোকা ভাইটার ওপর চাপাতে চেয়েছিল? তার নামে দুর্ণাম রটাতে পারে। আর ...'

'আমার ওপর হামলা করবে না তো আবার?'

'করতেও পারে। তোকে সাবধান হয়ে চলাফেরা করতে হবে।'

'আমি অন্দরের বাইরে পা দেব না বুজান?'

'তাহলে তো আরও ভাল। বাইরে বেরুলেও পর্দা করে বেরুবি। তবে মনে হয় যা ঘটে গেছে তা যখন আমরা জেনে গেছি তখন বড় আম্মার ভাইয়েরা আর আগে বাড়বে না। মাহমুদের আব্বাকে আমার সৎ মামুরা একটু ভয় পায়। গাঁয়ের লোকেরাও এসব জানলে ছি ছি করবে। তাছাড়া বড়বিবির ভাইয়েরা জানে, এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে আমিও সহজে ছেড়ে দেব না। বড়বিবিকে আমার বাপের ভিটেয় থাকতে হলে আমার হাতের মুঠোয় থাকতে হবে। তারা তোর ক্ষতি করলে আমিও যে তাদের বোনের ক্ষতি করতে পারি সেটা কি তারা হিসেব না করে পারবে? যা, এখন গিয়ে তোর বিছানাপত্র আর লোয়াজিমা নিয়ে ফিরে আয়। আমি ওবাড়ি থেকে তোর আর মাহমুদের রাতের খাবার পাঠিয়ে দেব।'

একথা বলে জাহানারা এবাড়ির গেটের চাবি নিঃসংকোচে মর্জিনার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

যে দিন থেকে মাহমুদের প্রথম হাইস্কুলে যাবার কথা সেদিন খুব ভোরে তৈমুর ও জাহানারা এসে দেখে মাহমুদ আগেই গোসল সেরে পোশাক পরে তৈরি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টেরি কাটছে। পাশে বসে মিশনের মারিয়া কুকার বন্ধুকে এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। মর্জিনাও মাহমুদের জন্য নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত। মর্জিনা আসার পর মাহমুদ নিজেদের বাড়িতেই নাস্তা খায়। রাতের খাবারও। কেবল দুপুরে মামুদের বাড়িতে মায়ের হাতে একবেলা খেতে যায়। তাও তার অনিচ্ছায়। না গেলে মা আর সারোয়ার মামু রাগ করেন বলে।

তৈমুর ও জাহানারা খাটের ওপর বসল। দু'জনের মুখেই চাপা আনন্দ।

তৈমুর বলল, 'তোর ভর্তির সবকিছু আমি মিটিয়ে এসেছি। আজ থেকে যখন ক্লাসে যাচ্ছিস তখন ঘর থেকে বেরুবার সময় তোর মাকে কদমবুসি করে আল্লাহ'র নাম নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে বেরুবি। ক্লাসে বসে বলবি রাব্বী যিদনী এলমা। মাস্টার সাহেবদের আদবের সাথে সালাম জানাবি।'

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই মাহমুদ জবাব দিল, 'জী আব্বা।'

তারপর উঁচু হয়ে বাপ-মাকে কদমবুসি করল।

তৈমুর ছেলের মাথায় হাত রেখে বলল, 'থাক। তোর ইস্কুল তো ন'টা থেকে শুরু। অত আগে রওনা হবি?'

'নাস্তা খেয়ে মারিয়াকে নিয়ে ফাদারকে সালাম জানাতে যাব।'

'খুব ভালো। ফাদারকে বলবি তোর মঙ্গলের জন্য যেন একটু দোয়া করেন।'

'বলব আব্বা।'

'আমি তাহলে দোকানে যাই।'

তৈমুর উঠে দাঁড়াল।

তৈমুর বেরিয়ে গেলে জাহানারা ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তোর আব্বা আজ খুব খুশী। সারা রাত কেবল তোর কথাই বলেছে। সাত সকালে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'চল ওবাড়ি গিয়ে ছেলেটাকে জাগিয়ে দিয়ে আসি। আজ থেকে হাই ইস্কুলে যাচ্ছে, দোকানে যাওয়ার আগে একটু দেখে আসি। তোর আব্বার খুশীটা আমি ধরতে পারি তো!'

মাহমুদ কিছু না বলে মুচকি হাসল।

'মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করিস বাবা। তোর আব্বা তোকে অনেক বড় বিদ্বান বানাতে চায়। তোর বাপ নিজে তো এককালে খুব ভালো পড়ুয়া ছিল। কিন্তু আমার আব্বার জন্য লেখাপড়া করতে পারল না। তোর নানা তাকে তার কারবারে ঢুকিয়ে দিলেন। এখন তোকে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে তোর বাপ সেই সাধ পূর্ণ করতে চায়।'

মায়ের কথায় মাহমুদ মাথা নুইয়ে থাকল।

মারিয়া এতক্ষণ চুপ করে এ পরিবারের মুরুব্বীদের কথাবার্তা শুনছিল। এদেশের একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের গার্জিয়ানদের মনে যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এ ধরনের স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্খা থাকতে পারে তা মারিয়া ভাবেনি। সচরাচর দেখেওনি। মারিয়ার খুব ভালো লাগল।

'মাহমুদ একদিন বিলেত যাবে আন্টি দেখবেন, আমি বললাম।'

হাসল মারিয়া। সে জাহানারাকে সাধারণত খালা বলে ডাকে। এখন হঠাৎ আন্টি বলাতে জাহানারাও হাসল।

মাহমুদ বলল, 'ইস, ইনি সব জানেন।'

'আমি সব জানিই তো। দেখো আমার প্রিডিকশন একদিন ঠিক ঠিক ফলে যাবে। চান্স পেলে বিলেতে যাবে না তুমি?'

'যাব না আমি বলেছি নাকি? চান্স পেলে তো তোমাদের নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত

যেতে রাজি। পড়তে পড়তে যতদূর যাওয়া যায় সব জায়গায় যাব।'

হেসে উঠল মাহমুদ।

ছেলের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের ঝিলিকে জাহানারার মুখেও খুশীর হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে মর্জিনা নাস্তার দু'টি প্লেট এনে মাহমুদ ও মারিয়ার সামনে রাখল। প্লেট জুড়ে বড় আকারের দু'টি কাতলা মাছের শুকনো ভাজি। এর পাশে ডিমের ওমলেট আর সামান্য গরম ভাত।

নাস্তার বৈচিত্র দেখেই মারিয়া হেসে ফেলল, 'মর্জি তো খুব ভালো মেয়ে!'

মর্জি এ কথায় শরম সামলতে অযথা মাথায় কাপড় টেনে জাহানরার দিকে ফিরল, 'বুজান আপনাকে নাস্তা কি দেব?'

'আমি এত সকালে ভাত খেতে পারি নারে মর্জি। আমাকে শুধু এককাপ চা দে। সকালে ওবাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। এখন বলতো এতবড় কাতলা মাছ কোথায় পেলি? এতো আমাদের এ বাড়ির পুকুরের মাছ বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ বুজান, একটু আগে জেলে পাড়ার লোকেরা পুকুরে জাল ফেলেছিল। এ আপনাদের ভাগের মাছ। আরও অনেকগুলো ডোলায় রেখেছি। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন।'

মর্জিনার কথা শেষ হতেই মারিয়া মাছ ভেঙে খেতে শুরু করেছে।

জাহানারা হেসে বলল, 'সাবধানে খাও গো সাদা মেয়ে। ও মাছে খুব কাঁটা আছে। তবে এর চেয়ে স্বাদের মাছ আর হয় না।'

এ কথা বলে জাহানারা নিজেই মাহমুদের প্লেট থেকে মাছ তুলে নিজেই কাঁটা বেছে ছেলের মুখের কাছে তুলে বললেন, 'নে খা।'

নাস্তা শেষ হলে জাহানারা উঠল।

'তাহলে আমি যাই। তুই ফাদারকে সালাম জানিয়ে ইস্কুলে চলে যাস। আর তোর আব্বার কথামত সবাইকে সালাম জানাবি আর সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবি। সাবধান, সহপাঠিদের সাথে ঝগড়া-মারামারি করবি না।'

মাহমুদ আবার মাকে কদমবুসি করল।

রাস্তায় বেরিয়েই মাহমুদ বলল, 'তোমার ভর্তির কি হল মিস কুকার? বলেছিলে সরোজিনীতে ভর্তি হবে?' ফাদার এখনো তোমার ভর্তির বিষয়টা শেষ করছেন না কেন?'

'ঠিক জানি না। ফাদার কি যেন ভাবছেন।'

বিষণ্নভাবে গা ছাড়া জবাব দিল মারিয়া। মাহমুদ জানে এই এতিম মেয়েটির ভর্তি ও লেখাপড়ার ব্যাপারটা মিশনের দয়ার ওপর নির্ভর করছে। ফাদার যদিও মারিকে নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসেন তবুও ওদের মিশন কম্যুনিটিতে কি যেন কি একটা আছে। এখনও মারির ভর্তির বিষয়ের ফয়সালা হয়নি। এদিকে মিশনের খৃস্টান ছেলেমেয়েদের মধ্যে মারিয়া কুকারের রেজাল্টই সবচেয়ে ভালো।

মাহমুদ বলল, 'কৃষ্ণা সম্ভবত কুমিল্লার ফয়জুননেসায় ক্লাস শুরু করে দিয়েছে।'

'দিক। প্রভু যীশুর আমার জন্য যেমন ইচ্ছে তেমনি হবে। আমি এ নিয়ে খুব ভাবব না। জানো তো আমার আপনজন কেউ নেই। তোমার মায়ের মত মাথায় চুমো খেয়ে আমাকে কেউ ইস্কুলে বিদেয় করবে না। তোমার আব্বুর মত নিজে গিয়ে ভর্তিও করে দিয়ে আসবে না। প্রভু যীশুই আমার সব। একদিন আমি যীশুরই হয়ে যাব।'

কথাগুলো মারিয়া এমনভাবে বলল যে মাহমুদের খুব খরাপ লাগল। যীশুরই হয়ে যাব কথার ইঙ্গিতটা মাহমুদ ধরতে পারল না। মাহমুদ ভাবল মারিয়া বোধ হয় হতাশা থেকে মৃত্যুর কথা বলছে। সে চমকে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'যীশুরই হয়ে যাবে মানে?'

মারিয়া মাহমুদের চমকে যাওয়া দেখে জোরে হেসে উঠল, 'কি বোকা ছেলে তুমি, একথারও মানে জানো না?'

'জানবো না কেন, যীশুরই হয়ে যেতে চাওয়া তো মরে যাওয়ার কথাই বোঝায়।'

'দূর বোকা, আমি প্রভুর হব বললে বোঝায় আমি নান হব। প্রভুর সেবিকা হব, বুঝলে?'

'কিন্তু সেটা কি করে হবে, তুমি তো ক্যাথলিক নও। তোমাদের সম্প্রদায় তো আলাদা। তোমরা তো প্রটেস্টান্ট মিশনের? তোমাদের চার্চ তো ভিন্ন?'

'প্রভুর প্রেমিকা হতে চাইলে কোনো সম্প্রদায় লাগে না, বুঝলে?

মারিয়ার একথায় মাহমুদ থতমত খেয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। এসব ধর্মীয় জটিলতার কথা মাহমুদ তেমন না বুঝলেও সেও একটি প্রাচীন মুসলিম মোল্লা পরিবারেরই সন্তান। নিতান্ত ছেলে মানুষ হলেও সে একটি খৃস্টান পাড়ারই প্রতিবেশী এবং মিশন ইস্কুলের ছাত্র। তার আম্মা এবং খালাম্মারাও এই ইস্কুলে লেখাপড়া করে গেছেন। খৃস্টানদের মধ্যে যে অনেক সম্প্রদায় আছে তা মাহমুদের অল্পবিস্তর জানারই কথা। তার ধারণা, একমাত্র ক্যাথলিকদের মধ্যেই সন্যাসিনী

বা নান হওয়ার প্রথা আছে। অথচ মারি তো ক্যাথলিক নয়।

মাহমুদ হঠাৎ পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে মারিয়া হেসে বলল, 'অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি এখানে প্রটেস্টান্ট মিশনের অরফেন হলেও আমার বাপ-মা ক্যাথলিক ছিলেন। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রটেস্টান্ট চার্চের আওতায় বাপ্তাইজ হইনি। আমি একজন ক্যাথলিক মেয়ে। যীশুর দাসী হতে আমার কোনো বাধা নেই। ফাদার এ জন্য আমাকে কিছু বলবেন না। তবে তো তিনি আগেই তার সম্প্রদায়ে দীক্ষা দিতেন। বোঝ না এ কারণেই এখানে কেউ আমার ভালোমন্দের ব্যাপারে বেশী গা করে না। সকলেই ভাবে আমি তাদের সম্প্রদায়ের নই। একদিন আমি এ মিশন ছেড়ে চলে যাব।'

এবার যেন মাহমুদের কাছে মারিয়ার প্রতি এই মিশনবাসীদের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণগুলো ঈষৎ স্পষ্ট হল। মারিয়া তাহলে ফাদার জোনসের আশ্রিতা হলেও এ মিশনের খৃষ্টানদের কেউ নয়?

মাহমুদ হঠাৎ কি ভেবে যেন বলে ফেলল, 'না মিস কুকার, তুমি প্রভুর প্রেমিকা হয়ো না।'

একথায় মারিয়া বুকপিঠ দুলিয়ে চাপা হাসির ফোয়ারা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যীশুর প্রেমিকা হব না তো কার প্রেমিকা হব, তোমার?'

এ প্রশ্নে মাহমুদ লজ্জিত হয়ে মাথা নুইয়ে ফেলল, 'আমি ওকথা বলেছি বুঝি? আমি বলতে চাইছি...।

'থাক আর চাইতে হবে না, এখন চলো তাড়াতাড়ি ফাদারের আশীর্বাদ নিইগে। তোমার ইস্কুলের সময় হয়ে এল।'

মহমুদকে এক রকম টেনেই মারিয়া গীর্জা বাড়ির দিকে নিয়ে চলল।